কাব্যকথা

শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন এম এ, প্রণীত।

Calcutta
S. K. LAHIRI & Co.
54 College Street

1909

মূল্য ১।০ আনা।	বাঁধাই ১॥০ টাকা মাত্র

ভূমিকা।

এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি কয়েকখানি মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। অধিকাংশ প্রবন্ধ "পূর্ণিমা" ও "নব্যভারত" এ প্রকাশিত হইয়াছিল। "বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সম্প্রদায়" নামক প্রবন্ধটি প্রায় নয় বৎসর পূর্ব্বে বাহির হইয়াছিল। "বাঙ্গালা কবিতার ভাষা ও ভাব" প্রবন্ধটি ১৩১৩ সালে বাহির হইয়াছিল।

দিনাজপুর
পৌষ ১৩১৫

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

বিষয়— পৃষ্ঠা।

কুমারসম্ভবের উমা।

কালিদাস উমাচরিত্রে কোনরূপ দেবভাব আরোপিত করেন নাই। যদিও পূর্ব্বজন্মের যোগবিসৃষ্টদেহা সতীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি উমাতে অতিমানুষ অথবা অলৌকিক কোন ক্ষমতা আরোপ করেন নাই। এই জন্যই উমাচরিত অধিক মনোজ্ঞ এবং সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছে। এমন কি উমাচরিত সম্পূর্ণরূপে নারীজাতির আদর্শস্থানীয় হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কবি প্রচলিত হরগৌরী উপাখ্যান হইতে উমাচরিত এরূপ কাব্যোপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তাহা হইতে হিন্দুনারীর চরিত্র জন্ম হইতে পরিণয়ক্রিয়া পর্য্যন্ত কিরূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়া উচিত বেশ বুঝা যায়। উমা একদিকে অতি মৃদুস্বভাবা, বিনীতা, ভক্তিমতী, আর একদিকে বিদ্যাবতী, প্রখর বুদ্ধিমতী এবং কঠোর তপঃস্বিনী! কবি আবার তাঁহাকে শকুন্তলাদির ন্যায় অতিশয় কোমল-তনু করিয়াছেন; তপস্যা শকুন্তলাকেও যেমন সাজে না উমাকেও তেমনি সাজে না। প্রচলিত উপাখ্যানের উমা এত কোমলা, মৃদুস্বভাবা নহেন। আমরা গিরীশ-গৃহিণী গৌরী বলিলে একটু উগ্রচণ্ডমূর্ত্তি বলিয়া বুঝি। আমাদের দেশে এরূপ বুঝিবার কতকগুলি কারণ আছে। অস্মদ্দেশপূজিতা আশ্বিনের অম্বিকাদেবী উগ্রচণ্ডমূর্ত্তি মহাশক্তি; বাসন্তী অন্নপূর্ণাও জগতের অন্নদায়িনী বলিয়া মহাশক্তিশালিনী। আরো একটী কারণ আছে। বাঙ্গালীর

প্রিয়কবি ভারতচন্দ্র মহাদেবীকে বিধিবিষ্ণুহরের প্রসূতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইঁহাতেই সর্ব্বশক্তি আরোপ করিয়াছেন। গুণাকরের শিবঠাকুর শিবানীর হস্তের ক্রীড়াপুত্তলের ন্যায় হইয়াছেন। কালিদাসের উমা ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সৃষ্টি।

উমার বাল্যলীলা বড়ই সংক্ষেপে কিন্তু ধারাবাহিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনা খুব সাদাসিদে। অলঙ্কারের পারিপাট্য নাই। শৈলবধূ মুনিগণেরও মাননীয়া মেনকাদেবী শুভদিনে কন্যারত্ন প্রসব করিলেন। বন্ধুজনেরা কন্যার নাম পর্ব্বতরাজপুত্রী বলিয়া পার্ব্বতী রাখিলেন; কিন্তু তাঁহার উমা নামই প্রসিদ্ধ হইল। তাহার একটু কারণও ছিল। তপস্যা করিতে যাইও না মাতার এই নিষেধবাণী হইতে উ এবং মা এই দুই শব্দের যোগে উমানামের উৎপত্তি হইল। ভারতচন্দ্র উমানামের আর এক ব্যাখ্যা দিয়াছেন;

> "উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে স্ত্রী তাঁর।
> বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈলা সার॥"

তারপর বালিকা দিনে দিনে চান্দ্রমসীলেখার ন্যায় বাড়িতে লাগিলেন। সখীসমেতা হইয়া মন্দাকিনী-পুলিনে পুত্তল ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিদ্যাশিক্ষার সময় হইল। কিন্তু বিদ্যাভ্যাসের সময় তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। বালিকা মেধাবিনী ছিলেন; পূর্ব্বজন্মাভ্যস্ত বিদ্যাও সহজে তাঁহার আয়ত্ত হইল। কালিদাস জন্মান্তরবাদী ছিলেন। হিন্দুমাত্রেই জন্মান্তরবাদী। মহাকবি সময়ে সময়ে তাঁহার কাব্যমধ্যে এই জন্মান্তরবাদ বড়ই মধুররূপে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। শকুন্তলায় বলিয়াছেন;

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরানি জননান্তর সৌহৃদানি॥"

আজকালকার শিক্ষিত হিন্দুও বোধ হয় জন্মান্তর মানিয়া থাকেন। গীতার ভগবদুক্তির মর্ম্মও এইরূপ

"তত্রতং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥"

এই জন্মান্তরের কথাটি বড়ই কবিতাময়। একজন্মবাদী খৃষ্টান-ভাবুক কবিরাও প্রতিভাবলে সময়ে সময়ে এই সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন। ভাবুক কবি Wordsworthএর "আত্মায় অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে গীতিকবিতা" ইহার দৃষ্টান্ত। কবিগণ প্রায়ই কাব্যের নায়কনায়িকাদের বাল্যজীবনের বর্ণনা করেন না। তাহা সর্ব্বজনবিদিত এবং প্রায়ই বিশেষত্ব-বিহীন। কাব্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণকে ঘটনাচক্রে ফেলিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদের মহত্ব প্রদর্শন করান। কালিদাস উমার বাল্যলীলা এবং যৌবনের ধারাবাহিক বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার একটা কারণ বোধ হয় এই যে কালিদাস পরিণয় পর্য্যন্ত আদর্শনারীর কিরূপ চরিত্র হওয়া উচিত ইহাই কুমারসম্ভবে দেখাইতেছেন, এইজন্য বাল্যকৈশোরের বর্ণনার অবতারণা। আর একটু বিশেষ কারণ আছে। স্বার্থান্ধ দেবতারা এবং স্বয়ং মদনদেবও এই উমারূপের উপর বড়ই নির্ভর করিয়াছিলেন। সেইজন্য উমারূপের এত তন্ন তন্ন করিয়া বর্ণনা। যে সে সৌন্দর্য্য নয় অলোকসামান্য দেহ সৌন্দর্য্য দ্বারাও আদর্শ পতি প্রেম পাওয়া যায় না। এই প্রেমের অধিকারিণী হইতে হইলে মানসিকবৃত্তিগুলির সৌন্দর্য্যেরও

সম্যক্ স্ফূর্ত্তি চাই। এইজন্য কবি প্রথমে উমার বাল্যরূপের বর্ণনা করিয়া ১৭টি শ্লোক দ্বারা উমার যৌবনের চূড়ান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। অনুপম সৌন্দর্য্যময় যৌবনের বর্ণনা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। অলঙ্কারগুলিও বড় সুন্দর। পার্ব্বতী যৌবনে পদার্পণ করিলেন; কবি বলিলেন, "নবযৌবনে উমাদেহ চতুরস্রশোভিত হইয়া উদ্ভাসিত হইল; যেন তুলিকা দ্বারা চিত্র উন্মীলিত হইল; যেন সূর্য্যাংশু নলিনীকে বিকসিত করিল"। ইহার পর নারদমুনি একদা হিমালয় সমীপে তাঁহার কন্যাকে দেখিয়া বলিলেন, ইনি হরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী একপত্নী হইবেন। গিরিরাজ সেইজন্য কন্যা প্রাপ্তযৌবনা হইয়াছে দেখিয়াও বরান্তরের অনুসন্ধান করিলেন না। কিন্তু মহাদেব নিজে স্বকন্যার পাণিপ্রার্থী হন নাই বলিয়া উমার পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন করাইতে পারিলেন না। গিরিরাজ ভরসা করিয়া নিজে শিবের কাছে গেলেন না। তাঁহার ভয় হইল পাছে মহাদেব তাঁহার কথা না রাখেন। সে কালের লোকেরা বোধ হয় আজকালকার মত কন্যাদায়ভীতিগ্রস্ত ছিল না। কন্যার অভিভাবকেরা বোধ হয় বরান্বেষণে তত ব্যস্ত হইতেন না; বরেরাই স্বয়ং দেখা দিতেন। পশুপতি সতীর দেহত্যাগের পর আর দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি মন্দাকিনীবিধৌত হিমাচলের কোন অধিত্যকা প্রদেশে নিয়তচিত্ত হইয়া তপস্যা করিতেছিলেন; কি ফল উদ্দেশে তপস্যা করিতেছিলেন তিনিই জানিতেন; কারণ তিনি নিজেই অন্যকে তপস্যার ফল প্রদান করিবার বিধাতা। অদ্রিনাথ স্বয়ং এই দেবাদিদেবের পূজা করিয়া কন্যাকে ইঁহার আরাধনা করিবার জন্য আদেশ করিলেন। জয়া বিজয়া সখীদ্বয়কেও এই কার্য্যে সহায়তার জন্য উমার নিকট রাখিয়া দিলেন। ভূতনাথ

বালিকাদিগকে তাঁহার সেবা করিতে মানা করিলেন না। তপস্বীর কাছে রমণীর অবস্থান সমাধির অন্তরায় জন্মাইতে পারে বটে; কিন্তু ধূর্জ্জটি সেরূপ তপস্বী নহেন। সহস্র অন্তরায়ও তাঁহার মত ধীরের চিত্তবিক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না। এদিকে পার্ব্বতীও প্রত্যহ গিরিশের পূজা করিতে লাগিলেন। তিনি পূজার ফুল তুলিলেন, সন্মার্জ্জন দ্বারা বেদি পরিষ্কার করিতেন। নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানের জল ও কুশ আনিতেন, এইরূপে প্রতিদিন পরিশ্রম করিয়া মহেশ্বরের শুশ্রূষায় নিযুক্তা রহিলেন।

পিতৃনিদেশে নগেন্দ্রকুমারী গিরিশের পূজায় প্রবৃত্তা হইলেন। রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া রাজকন্যোচিত ভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়া গৌরী মন্দাকিনীতীরে কোথায় এক দেবদারুবনে মহাদেবের পূজা করিতে আসিলেন। সঙ্গে মাত্র দুইটি সখী। আর যাঁহার পূজা করিবেন তাঁহার অনুচর প্রমথগণ। এই সময় হইতেই কবি উমাচরিত্রের চরমোৎকর্ষ এবং মাহাত্ম্য দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। সত্য বটে পিতার আদেশ অনুল্লঙ্ঘনীয় এবং উমাও হিন্দুরাজপুত্রী। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনাবলী দ্বারা দেখা যায় যে কেবল কর্ত্তব্যবোধে নয় উমা প্রীতিপূর্ব্বক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াও ত্যাগস্বীকার করিয়া কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত আরম্ভ করিলেন। এখন হইতেই আমরা বুঝিতে পারিলাম যে এই কুসুমসুকুমার কমনীয় দেহখানি কঠোর তপশ্চর্য্যার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ও অধিকারী হইবে। পিতা দেখাইয়া দিলেন এই মহাদেব তোমার অনুরূপ বর, তুমি ইঁহার যোগ্য হইতে চেষ্টা কর; ইঁহার পূজা কর, হয়ত সফলমনোরথ হইবে। উমা মেধাবিনী এবং বিদুষী। উমা বুঝিলেন কুমারীজীবনের একটি অবশ্যকর্ত্তব্যকর্ম্ম অনুরূপ ভর্ত্তৃলাভের চেষ্টা। আরো দেখিলেন মহেশ্বর অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠবর ত্রিভুবনে আর কেহ নাই; এবং ব্রতাদিঅনুষ্ঠান প্রভৃতি ভগবৎপ্রিয়কার্য্য সাধন ব্যতীত এই ভর্ত্তৃলাভের অন্য কোন উপায় নাই; "অবাপ্যতে বা কথমন্যথা দ্বয়ং, তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ"। এই জন্য আনন্দিত মনে হরপূজায় মনোনিবেশ করিলেন। আমরা ক্রমশ দেখাইব যে এই কুমারসম্ভব কাব্যের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। এই হরগৌরী আদর্শদম্পতি। এই মহাদেব পুরুষোত্তম; আর এই গৌরী আদর্শকুমারী। মহাদেব কেন আদর্শ পুরুষ, এবং এই গৌরী কেন আদর্শ রমণী ইঁহাদের পরস্পরের মিলন, পরিণয়ক্রিয়া কি উপায়ে সংঘটিত হইতে পারে, হিন্দুনরনারীর পরিণয় কার্য্য কি অপূর্ব্ব ধর্ম্মের বন্ধন কি মহান্ বিরাট ব্যাপার এই সকল বুঝাইয়া দেওয়াই কাব্যের উদ্দেশ্য। এই কাব্যে হরগৌরীর যে অপূর্ব্ব প্রেম বর্ণিত হইয়াছে তাহার পবিত্রতা স্বর্গীয়, তাহার গভীরতা অপরিমেয়; ইহা সম্পূর্ণরূপে কামগন্ধবর্জ্জিত। ইহাতে রূপজ মোহ— থাকিতে পারে না; ইহাতে বাহ্যজগতের প্রভাব থাকিতে পারে না। মদনের সম্মোহন বাণ ইহার নিকট ব্যর্থ; মদনভস্ম দ্বারাই ইহার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। পুরুরবা ও উর্ব্বশীর প্রেম ইহার সহিত তুলনীয় হইতে পারে না; রোমিও জুলিয়েটের প্রেম ইহার সমকক্ষ নয়; দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার প্রেম ইহা হইতে সম্যক্ স্বতন্ত্র। ইহার সহিত তুলনীয় হইতে পারে কেবল এক পতি দেবতা সীতা এবং লোকোত্তরচরিত রামচন্দ্রের প্রেম। পতি পত্নীর প্রেম এইরূপই হওয়া উচিত। এই অপূর্ব্ব প্রেমের স্বরূপ বুঝাইবার জন্যই কবি উমাকে এই কঠোর ব্রত ধারণ করাইলেন। এরূপ না করিলে কি পতী পত্নীর স্বর্গীয় প্রেমের উৎপত্তি হইতে পারে? হাবভাব কোর্টসিপে এই প্রেম লাভ হয়

না। অশেষ গুণশালিনী নারীর সহিত সর্ব্বগুণাধার পুরুষের মিলন হইতে হইলে কঠোর ব্রতের আবশ্যক। চিরস্থায়ী প্রেম সহজসাধ্য নয়; কঠোর ব্রতসাধ্য। এই জন্য উমার যৌবনের প্রারম্ভেই নিয়মব্রতানুষ্ঠান। তার পর তপস্যা এবং বহুকষ্টের পর তপস্যার ফললাভ। এই অপূর্ব্ব মিলনেই অসুরবিজয়ী কার্ত্তি-কেয়ের সম্ভব হইতে পারে। অন্য দম্পতী হইতে কুমারসম্ভব সম্ভবপর নহে। পশুপতির ন্যায় পতি পাইবার জন্য এবং কুমারের ন্যায় পুত্রলাভ করিবার উদ্দেশে উমার এই ব্রতানুষ্ঠানকে আদর্শ করিয়া কুমারী হিন্দুবালিকারা আজও পর্য্যন্ত অতি শৈশব হইতে যথাবিধি নিয়মপূর্ব্বক শিবপূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

উমা এইরূপে শিবপূজায় নিরতা রহিলেন। এদিকে দেবতারা এক মহাগণ্ডগোল বাঁধাইল। তারক নামে এক মহাসুর ব্রহ্মার বরে ত্রিভুবনের অধিপতি হইয়া দেবতা প্রভৃতিকে বড়ই সন্তাপিত করিতেছিল। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, সরিৎ, সাগর, ভূধর, প্রভৃতি সকলেই মহা পীড়িত। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, দেবতাদিগের দেবত্ব বিলুপ্তপ্রায়। দেবতারা তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া ম্লানমুখে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া কমলযোনির স্তব আরম্ভ করিলেন। পিতামহ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন "তোমরা কিছুদিন প্রতীক্ষা কর; তোমাদের মনোরথ সফল হইবে; এই বিষবৃক্ষ আমি নিজে বাড়াইয়াছি; নিজে ইহার উচ্ছেদ করিতে পারি না। ভগবান্ নীললোহিতের আত্মজ ব্যতীত কেহই এই দৈত্যকে পরাজয় করিতে পারিবে না। সেই পরাৎপর পুরুষ এক্ষণে সমাধি নিমগ্ন হইয়া আছেন। তোমরা এক্ষণে উমারূপের সাহায্যে তাঁহার মন আকর্ষণ করিতে চেষ্টা কর। উভয়ে উভয়ের যোগ্য। এই যোগ্য দম্পতীর পুত্রই

তোমাদের সেনাপতি হইয়া তারকাসুরকে সংহার করিতে পারিবে"। দেবতারা সৎপরামর্শ পাইয়া নিজস্থানে গমন করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে দেবরাজ ইন্দ্র কন্দর্পকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রেই মন্মথদেব কৃতাঞ্জলিপুটে দেবরাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; তারপর মোসাহেবী আরম্ভ করিলেন এবং নিজের খুব বড়াই করিতে লাগিলেন। বড়াই করিতে করিতে ফুলধনু বলিয়া ফেলিলেন, "আমি প্রিয়সখা বসন্তের সাহায্যে পিণাকপাণি মহেশ্বরেরও ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে পারি"। দেবতারা তাঁহাকে পাইয়া বসিলেন। দেবরাজ বলিলেন, "ঠিক তাহাই করিতে হইবে; হরগৌরীর মিলন করিতে হইবে; নতুবা দেবলোক ধ্বংস হইয়া যায়"। তারপর সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া, খোসামোদ করিয়া সুরপতি মধুমন্মথকে হরযোগাশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে হইবে, উমারূপের মোহে তাঁহার মনকে মুগ্ধ করিতে হইবে। পুষ্পধনু প্রথমে বড়াই করিয়া ধরা পড়িয়াছেন। অগত্যা স্বীকৃত হইয়া চলিলেন; সঙ্গে সভয়ে চলিলেন প্রিয়সখা বসন্ত আর প্রিয়তমা বধূ রতিদেবী।

এদিকে এই মহাষড়যন্ত্র হইল, কিন্তু উমাদেবী ইহার কিছুই জানিলেন না। উমাচরিত্র শুদ্ধ, পবিত্র, নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক। অবৈধ উপায় অবলম্বন করা এই চরিত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী। কাজে কাজেই এই ষড়যন্ত্রের বিষয় উমাকে কিছুই জানান হইল না। যখন ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হইল তখনই কেবল তিনি প্রকৃত বিষয় অবগত হইলেন। তিনি যেমন সখীগণের সহিত পুষ্পপত্র জলাদি আহরণ করিয়া পশুপতির শুশ্রূষা করিতেছিলেন সেইরূপ করিতে লাগিলেন। বনস্থলীমধ্যে মধুমন্মথের আকস্মিক আবির্ভাব

অনুভব করিতে পারিলেন না। সদ্যোসমাগত বসন্তপ্রভাবে দ্রুমপুষ্পাদিতে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া পড়িল। বসন্তের সমাগমে অশোক ফুটিল, সহকার মঞ্জরিল, কর্ণিকার, পলাশ, বিকশিত হইল, মলয় বহিল। পিয়ালের মঞ্জরীকণায় মৃগেরা অন্ধবৎ হইয়া বনস্থলীর শুষ্কপত্রের উপর বিচরণ করিতে লাগিল।* তারপর রতিমন্মথের প্রভাবে স্থাবর জঙ্গম সকলেরই দ্বন্দ্বভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। ভৃঙ্গমিথুন এক কুসুমপাত্রে মধুপান করিতে লাগিল; কৃষ্ণসার শৃঙ্গস্পর্শে মৃগীর মন মোহিত করিল। গজমিথুন, চক্রবাক-চক্রবাকী অনুরাগসূচক ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। শুধু তাই নয়; উদ্ভিদ্-জগতেও অনুরাগের সঞ্চার হইল।

"পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ স্ফুরৎ প্রবালোষ্ঠমনোহরাভ্যঃ।
লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপুঃ বিনম্রশাখাভুজবন্ধনানি॥"

---

* বর্ত্তমান লেখক এই মনোহর দৃশ্যটি একবার স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। মেদিনীপুর হইতে চাঁইবাসা পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে তাহার দুই পার্শ্বে শাল, পিয়াল প্রভৃতি বৃক্ষের নিবিড় বন আছে। বিগত বসন্তের শেষে কয়েকটি বন্ধুর সহিত এই পথ দিয়া চলিবার সময় দেখিলেন দুটি মৃগশিশু রাস্তার এক পার্শ্ব হইতে আর এক পার্শ্বে দ্রুতবেগে পিয়ালের জঙ্গল মধ্য দিয়া চলিয়া গেল; পিয়ালের বৃক্ষে তখন মঞ্জরী ছিল। পিয়ালের গাছ দেখিতে কতকটা ছোট শালগাছের ন্যায়। মঞ্জরী ঠিক আম্রমুকুলের ন্যায়। ফল দেখিতে ঠিক বৈঁচের ন্যায়; খাইতে খুব সুমিষ্ট, অম্লমধুর। পিয়ালের ফলের উৎকৃষ্ট শরবৎ হয়। অমরকবি এই বসন্তবর্ণনায় নিজের অপূর্ব্বকৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। পরবর্ত্তী কতকগুলি অত্যুজ্জ্বল চিত্রেও কবি নিজের অত্যাশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। মন্মথের প্রভাব, তপোনিরত মহাদেবের আশ্রম, বীরাসনে পশুপতির সমাধি, ব্রতধারিণী পার্ব্বতীর প্রবেশ, মদনভস্ম প্রভৃতির বর্ণনায় যেরূপ কবিত্ব আছে তাহা জগতে দুর্ল্লভ।

কিন্তু মহাদেব কি করিলেন। চিত্ত যাহাদের বশ, বাহ্যবিঘ্ন তাহাদের কি করিতে পারে। অপ্সরঃসঙ্গীত শুনিয়া মহেশ্বর আত্মানুসন্ধান-তৎপর হইলেন; আর তাঁহার অনুচর নন্দিকেশ্বর হস্তে হেমদণ্ড ধারণ করিয়া দ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন। অঙ্গুলিসঙ্কেতে নন্দী প্রমথগণের চাপল্য নিবারণ করিলেন। তাঁহার শাসনে বৃক্ষ নিষ্কম্প, ভৃঙ্গ নিশ্চল, পক্ষিসরীসৃপেরা ভয়ে শব্দ করে না, মৃগেরা প্রশান্তভাবে চরিয়া বেড়াইতেছে; জীব-সঙ্কুলা কাননভূমি যেন আলেখ্যে চিত্রবৎ রহিয়াছে। মহাদেবের অলৌকিক কঠোর তপঃপ্রভাব যেন বাহ্য প্রকৃতিতেও প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। কেবল মহাদেবের দেহ হইতে নয়, তাঁহার পরিপার্শ্বস্থ জড় প্রকৃতি হইতেও যেন তপস্যার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। কামদেব এমনি সময় ভূতনাথের আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন দেবদারুবেদিতে শার্দ্দূলচর্ম্ম বিছাইয়া পশুপতি সমাধিতে নিমগ্ন আছেন। বীরাসনে বসিয়া আছেন বলিয়া তাঁহার দেহোর্দ্ধভাগ নিশ্চল; উভয় অংসদেশ সন্নমিত। তাঁহার পরিধানে কৃষ্ণমৃগাজিন; জটাকলাপ ভুজঙ্গম বেষ্টিত। তাঁহার নেত্র স্পন্দহীন, দৃষ্টি নাসাগ্রনিবিষ্ট। প্রাণ-বায়ুর নিরোধ বশতঃ তাঁহাকে নিবাতনিষ্কম্প-প্রদীপবৎ বোধ হইতেছে। তিনি মনকে হৃদয় নামক অধিষ্ঠানে স্থাপন করিয়া আপনাকে আপনি ধ্যান করিতেছেন; কারণ তাঁহার পক্ষে অন্য পরমাত্মা নাই। তাঁহাকে দেখিয়া মন্মথ ভয়ে মোহগত হইলেন, তাঁহার হাত হইতে শরাসন শর পড়িয়া গেল; তিনি তাহা লক্ষ্য করিলেন না। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিলেন পর্ব্বতরাজপুত্রী সখী-ভূতা বনদেবতাদিগের সঙ্গে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তিনি অশোককর্ণিকার প্রভৃতি বসন্তকুসুমাভরণে বিভূষিতা; অরুণবর্ণদুকূল

পরিধানা বলিয়া তাঁহাকে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় দেখাইতেছিল। উমাদেহ বিলাসবিভ্রমে মণ্ডিত নহে, শুদ্ধচারিণী কুমারীর দেহ বাহ্যহাবভাবে পরিপূর্ণ নয়। বাহ্যসুষমাময় জড়-দেহের সৌন্দর্য্যে উমাদেবী মহাদেবকে বশ করিতে যান নাই। কুমারীসুলভ সরলতা ও পবিত্রতা দ্বারা, সেবাশুশ্রূষা দ্বারা, যমনিয়ম দ্বারা, তিনি পশুপতিকে পতিত্বে বরণ করিতে গিয়া-ছিলেন; গুণের দ্বারা গুণের আধারকে আকৃষ্ট করিতে গিয়া-ছিলেন। তাই উমার দেহযষ্টি নিরাভরণা; কেবলমাত্র পবিত্র বনকুসুমভূষিতা। সেই পবিত্র অলৌকিক সুন্দরমূর্ত্তি দেখিয়া কুসুমায়ুধের বলবীর্য্য কতকটা ফিরিয়া আসিল; নিজের কার্য্য-সিদ্ধি হইবে বলিয়া যেন কতকটা আশার সঞ্চার হইল। ক্রমে উমা শম্ভুর আশ্রমদ্বারদেশে উপনীত হইলেন। সেই সময়ে ভগবান্‌ও যোগবলে পরমাত্মসংজ্ঞ পরমজ্যোতির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরমানন্দধারা অনুভব কারতেছিলেন। ক্রমে তাঁহার যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইল; বীরাসন শিথিল হইল। নন্দী প্রণাম করিয়া নিবেদন করিল, শৈলসুতা শুশ্রূষার জন্য আসিয়াছেন; পরে দেবাদিদেব ভ্রূক্ষেপ দ্বারা অনুমতি প্রকাশ করিলে, দেবীকে প্রবেশ করাইলেন। তারপর প্রত্যহ যেমন হয় সখীরা প্রণতি-পূর্ব্বক বসন্তপুষ্পরাজি শিবের পাদমূলে ছড়াইয়া দিল। উমাদেবীও বৃষভধ্বজকে প্রণাম করিলেন; তাঁহার অলকরাশির মধ্য হইতে নবকর্ণিকার পড়িয়া গেল; কর্ণ হইতে পল্লব চ্যুত হইল। ধূর্জ্জটি আশীর্ব্বাদ করিলেন, "অনন্যভাজং পতিমাপ্নুহি"। কুমারীকে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আশীর্ব্বাদ করা যায় না। কুসুমশর অবসর বুঝিয়া শরাসনে জ্যা আরোপন করিলেন। পতঙ্গের অগ্নিপ্রবেশের পথ পরিষ্কার হইল। অহো কি বিড়ম্বনা!

নির্ব্বোধ দেবতারা কামের সাহায্যে প্রেমের স্ফূর্ত্তি দেখিতে চাহিয়াছিল! তারপর গৌরী মন্দাকিনীপদ্মবীজের জপমালিকা গিরিশকে অর্পণ করিলেন। ত্রিলোচন যেই তাহা গ্রহণ করিতে যাইবেন অমনি মন্মথ শরাসনে সম্মোহনবাণ সন্ধান করিলেন। চন্দ্রোদয়ে অম্বুরাশি যেমন ঈষৎ সংক্ষুব্ধ হয় চন্দ্রশেখর তেমনি ঈষৎ চঞ্চল হইলেন, বিম্বাধরা উমার মুখের পানে একবার তাকাইলেন। শৈলসুতাও বিকসনোন্মুখবালকদম্বকুসুমবৎ ঈষৎ কণ্টকিতা হইলেন এবং লজ্জানম্রমুখী হইয়া রহিলেন। কিন্তু জিতেন্দ্রিয় মহেশ্বর পুনর্ব্বার ইন্দ্রিয়সংক্ষোভ নিবারণ করিয়া কেন এমন হইল জানিবার জন্য চারিদিকে একবার চাহিলেন। দেখিলেন

"—দক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং নতাংসমাকুঞ্চিতসব্যপাদম্।
—চক্রীকৃতচারুচাপং প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্॥"

অমনি তপোবিঘ্নহেতু ক্রোধে ভ্রূভঙ্গ হইল; ললাট-নেত্র হইতে ধ্বক্ ধ্বক্ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। আর মদনকে কে রাখিতে পারে।

"ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি,
যাবৎ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা,
ভস্মাবশেষং মদনং চকার॥"

বজ্র যেমন বনস্পতিকে সমূলে উন্মূলিত করে, ভূতনাথ সেইরূপ তপস্যার অন্তরায়ভূত কামদেবকে ভস্মীভূত করিলেন; এবং স্ত্রীসন্নিধান পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইয়া ভূতগণের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। অপূর্ব্ব ইন্দ্রিয়জয় হইল। প্রেমের পবিত্রতা রক্ষা হইল। পতিপত্নীপ্রেমের যথার্থ স্বরূপ দেখাই-

বার অবসর হইল। উমাচরিত্রের বিকাশের পথ পরিষ্কার হইল।

মদনভস্ম কুমারসম্ভবের প্রধান ঘটনা। এই মদনভস্মের উপর উমাশম্ভুর অপূর্ব্বচরিত্রের ভিত্তি সংস্থাপিত। কামের ভস্ম না হইলে হরগৌরীচরিত্র অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। কামভস্ম না হইলে হরগৌরী-মিলন ধর্ম্ম-পরিণয় হইতে পারে না। মন্মথের বিনাশে একদিকে পশুপতির মহা অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গেল, আর একদিকে উমার তপস্যারূপ মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার অবসর হইল। মদনভস্মের জন্য উমার দায়িত্ব কিছুই নাই। উমা ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতেন না। পিতা হিমাচলও ইহার বার্ত্তা কিছুই জানিতেন না। যা কিছু দোষ দেবতাদের। কিন্তু তথাপি উমারূপের উপর দেবতারা নির্ভর করিয়াছিল বলিয়া পার্ব্বতী নিজের রূপের উপর কিছু বিরক্ত হইলেন। তিনি নিজে রূপে ভুলাইয়া মহাদেবকে বশ করিতে আইসেন নাই। যম-নিয়মের অনুষ্ঠান করিয়া, হৃদয়কে বিনীত করিয়া, রূপের গৌরব ভুলিয়া গিয়া, বিলাসবিভ্রম পরিত্যাগ করিয়া শুশ্রূষারূপ নারীধর্ম্ম দ্বারা পশুপতিকে পতিত্বে বরণ করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল না। দেবতারা বাদ সাধিলেন। অতর্কিতভাবে রূপের উপর যেন একটু দোষ আসিয়া পড়িল। অবশ্য নিজের রূপের জন্য কেহ দায়ী নয়। বিধাতা যদি কাহাকেও অলৌকিক রূপরাশি দেন আর সেই রূপরাশিতে যদি কাহারও চিত্তচাঞ্চল্য হয় তাহা হইলে রূপের অধিকারণীর কোন দোষ বা দায়িত্ব নাই। যাহার চিত্তবিকার হয় সেই সম্পূর্ণ দোষী। উমারূপে অবশ্য মহেশ্বরের চিত্তবিকার হয় নাই; এবং উমাও তাঁহাকে রূপ দেখাইয়া বশ করিতে যান

নাই। কিন্তু তথাপি তৃতীয় পক্ষীয়েরা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই রূপকে প্রাধান্য দিয়াছিল বলিয়া পার্ব্বতীরূপকে ধিক্কার দিলেন। "নিনিন্দরূপং হৃদয়েন পার্ব্বতী"। সেই জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন যে বিনশ্বররূপের নিগ্রহ করিবেন; তপস্যা দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তির রোধ করিবেন; চিত্ত শুদ্ধির দ্বারা, অন্তঃকরণের সৌন্দর্য্য দ্বারা, দেবাদিদেবের বরলাভ করিবেন। এই জন্য পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কবি মদনভস্মের দ্বারা পার্ব্বতীচরিত্রের ক্রমোন্নতি দেখাইলেন। আদর্শনারীর—আদর্শকুমারীর এইরূপ রূপগর্ব্ব দূরে নিক্ষেপ করিয়া, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা, গুণরাশি দ্বারা, সর্ব্বগুণশালী পতিলাভের চেষ্টা করা উচিত। এই আদর্শপতিই আবার কি মহান্ উন্নত চরিত্রের। তিনি "অরূপহার্য্য," অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের দ্বারা বশীকরণীয় নহেন। মদননিগ্রহ দ্বারা তাহা বেশ বুঝা গিয়াছে। কি কঠোর সংযমী; কি অলৌকিক ইন্দ্রিয়নিরোধ ক্ষমতা। ইহা ব্যতীত তাঁহার প্রাচীন বীরত্ব-কীর্ত্তি, অবদানপরম্পরাও অসংখ্য। কিন্নররাজকন্যারা তাঁহার প্রাচীন শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী গান করিয়া থাকে। তিনি অলোকসামান্যচরিত; তিনি নিষ্কাম। তিনি দরিদ্র হইয়াও সম্পদের আকর, তিনি শ্মশানবাসী হইয়াও ত্রিলোকীনাথ, তিনি ভীমাকার হইয়াও সৌম্যমূর্ত্তি। এরূপ স্বামী বিনা তপস্যায় কে পাইতে পারে। কবির এই মহাদেবচরিত্র সৃষ্টি অত্যাশ্চর্য্য ও অতি মহান্। আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ কোন কোন পুরাণকার এবং দু এক জন প্রাচীন বাঙ্গালীকবি এই আদর্শ চরিত্রকে যথেচ্ছভাবে চিত্রিত করিয়া দেবচরিত্রের অত্যন্ত অবমাননা করিয়াছেন। এমন কি কবিবর গুণাকরও পশুপতির এক অত্যন্ত কদর্য্য ছবি আঁকিয়াছেন। মদনভস্মের বর্ণনাতেই ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন—

"কিবা করে ধ্যান, কিবা করে জ্ঞান,
যে করে কামে শর।
শিহরিল অঙ্গ, ধ্যান হইল ভঙ্গ,
নয়ন মেলিয়া হর ॥
কামশরে ত্রাস্ত, নারী লাগি ব্যস্ত,
নেহালেন চারিপাশে।"

শুধু তাই নয়;

"মরিল মদন, তবু পঞ্চানন,
মোহিত তাহার বাণে।
বিকল হইয়া, নারী তপসিয়া,
ফিরেন সকল স্থানে ॥
কামে মত্ত হর, দেখিয়া অপ্সর,
কিন্নরী দেবী সকল ;
যায় পলাইয়া, পশ্চাৎ তাড়িয়া,
ফিরেন শিব চঞ্চল ॥"

কি ভয়ানক অবনতি ও অধোগতি। ভারতচন্দ্র শিব গড়িতে গিয়া এক অপূর্ব্ব জীব গড়িয়াছেন। আমরা কালিদাসের আদর্শ জিতেন্দ্রিয়মূর্ত্তি পূর্ব্বে দেখিয়াছি। হৈমবতী ক্রমে এই আদর্শ পতির উপযুক্তা হইয়াছিলেন। এই আদর্শদম্পতী, হরগৌরী, হিন্দুসাহিত্যে আছে বলিয়া হিন্দুর এত গৌরব। হিন্দুর বিবাহও এই জন্য এক মহান্ বিরাট ব্যাপার, ধর্ম্মের এক অপূর্ব্ব মহা-বন্ধন। যতদিন কালিদাসের এই অপূর্ব্ব মহাকাব্য হিন্দুনর-নারীর মধ্যে গৌরবের সামগ্রী বলিয়া সমাদৃত হইবে, ততদিন হিন্দুজাতির বিবাহপ্রথা পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং জগতের সর্ব্বত্র অনুকরণীয় বলিয়া গৃহীত হইবে।

মদনভস্মের দ্বারা মহাকবি দেখাইলেন যে পতিপত্নীর পবিত্র প্রেম মদনের সাহায্যে বিকাশ পাইতে পারে না। দম্পতীর প্রেম পবিত্র পুণ্যময়; ইহাই জগতের প্রকৃত প্রেম। ইহা সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম। এই মদন মহাপাপ। পাপের সাহায্যে পুণ্যের সঞ্চার হইতে পারে না। হিন্দুনরনারীর বিবাহের পূর্ব্বে কামভাব আদৌ বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। কামে যাহার উৎপত্তি কামেই তাহার লয় হইবার সম্ভব। কাজে কাজেই দাম্পত্য-প্রেমের উৎপত্তিতে কামের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। এই জন্যই আমাদের দেশে বিবাহের পূর্ব্বে ইউরোপীয় কোর্টসিপ্ প্রথা নাই। ইউরোপীয় কোর্টসিপে আছে, মোহকর হাবভাব, বিলাস, বেশভূষা, গন্ধমাল্য, রহস্যালাপ, নৃত্য, গীত, প্রভৃতি কামের পূর্ব্বানুচর। আরো একটু বিশেষত্ব আছে। পরস্পরের দোষ চাপিয়া রাখিয়া গুণের ভাগটি বিশেষ করিয়া পরস্পরকে দেখান ইহার প্রকৃত লক্ষণ। যৌবনের আবেশে নরনারীর অন্তর্দৃষ্টি তত সুতীক্ষ্ণ হয় না। তারপর কোর্টসিপের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলে পরস্পরের দোষগুণ ভাল করিয়া বুঝিবার অবসর হয় না। তার উপরে আবার উভয় পক্ষ হইতে আত্মদোষ গোপন করিবার বিলক্ষণ চেষ্টা। কাজে কাজেই উভয়ে উভয়কে পছন্দ করিতে গিয়া চন্দনতরুর পরিবর্ত্তে বিষলতার আশ্রয় করিয়া থাকেন। প্রেমের পরিবর্ত্তে কামের স্ফূর্ত্তি হয়; ক্ষণিক সুখের পর চির-বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। কখন কখন প্রেম Divorce আদালতে গিয়া ছড়াইয়া পড়ে। অবশ্য Courtship-এর প্রেম মাত্রই যে কামজপ্রেম হইবে এমন নয়। ইয়োরোপেও পবিত্র দাম্পত্য-প্রেমেরও সহস্র সহস্র উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে প্রেমের পবিত্রতা আছে সেখানে কামের আবির্ভাব থাকিতে

পারে না। আমাদের হিন্দুমতেরও এক রকম কোর্টসিপ্ হইতে পারে। পার্ব্বতীর তপস্যান্তে মহাদেব তাঁহাকে যেরূপে ছলনা করিয়াছিলেন, ইহাও একপ্রকার কোর্টসিপ্। কিন্তু ইহা হিন্দু কোর্টসিপ্। ইহাতে দোষের গোপন নাই; ইহাতে পরস্পর পরস্পরকে নিজের দোষগুণময় চরিত্র বিশ্লেষ করিয়া দেখান। পরস্পরের যা কিছু দোষ আছে তাহা সমস্ত অকপটভাবে প্রকাশ করিয়া বলাই এই কোর্টসিপের লক্ষণ। ব্রহ্মচারিবেশে মহাদেব নিজের সমস্ত দোষভাগ উল্লেখ করিয়া দেখিলেন গৌরী বাস্তবিকই তাঁহার প্রতি অনুরক্তা কি না। যদি এই সকল দোষ দেখিয়াও গৌরী তাঁহার প্রতি পূর্ব্ববৎ অনুরক্তা থাকেন তাহা হইলেই উভয়ের মিলন হইবে, নতুবা নহে। গৌরীও আপনাকে অতি দীনা অযোগ্যা বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার ভরসা কেবল তপোবল অর্থাৎ ব্রতনিয়মাদি দ্বারা আত্মোন্নতির চেষ্টা, মহাদেবের যোগ্যা হইবার চেষ্টা। এই জন্যই গৌরী ব্রহ্মচারীকে বলিলেন,

> "যথাশ্রুতং বেদবিদাং বর ত্বয়া
> জনোঽয়মুচ্চৈঃ পদলঙ্ঘনোৎসুকঃ।
> তপঃ কিলেদং তদবাপ্তিসাধনং
> মনোরথানামগতির্নবিদ্যতে॥"

যদি কোর্টসিপ্ করিতে হয় ত এইরূপ। এই হরগৌরীর Courtshipই হিন্দুর অনুকরণীয় হইবার যোগ্য।

বিবাহরূপ ধর্ম্মবন্ধনে কামের বিনাশ হওয়াই আবশ্যক। কবি প্রথমে মদনের প্রকৃতি দেখাইয়াছেন। পরে দেখাইয়াছেন এরূপ মদনের বিনাশ হওয়াই উচিত। হরগৌরীকে প্রেমেবদ্ধ করা ইহার কাজ নয়। মদনের কীর্ত্তিকলাপ তাহার নিজমুখেই

ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি পতিব্রতার ব্রতভঙ্গ করেন, ইন্দ্রের অবৈধ প্রণয়ের সাহায্য করেন, তপস্বীর তপোভঙ্গ করেন, চতুর্ব্বর্গপ্রার্থীর ধর্ম্মাদির পীড়ন করেন। দেবতারা এই অদ্ভুত বীরকে মহদেবকে গৌরীবিবাহে প্রবৃত্তি দিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অবৈধ প্রণয় সংঘটন করাই যাহার প্রকৃতি, পবিত্র হরগৌরী প্রেমের সে কি ধার ধারে। কাজেই মদনভস্ম অবশ্যম্ভাবী। মদনভস্মের আর একটা কারণ ছিল, প্রজাপতির শাপ। সেও একটা কুৎসিত কুকার্য্যের জন্য। সে যাহাই হউক এই মদন, সৌন্দর্য্যের—বাহ্যজগতের সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি। বাহ্যসৌন্দর্য্যের সাহায্যে পবিত্র-প্রেমের অধিকারী হওয়া যায় না কবি মদনভস্ম দ্বারা এইটি বিশদরূপে দেখাইয়াছেন। কিন্তু এদিকে আবার অপূর্ব্ব কৌশলের সহিত উমাচরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। পাছে উমাচরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করে এইজন্য কবি দেখাইয়াছেন উমা নিজে বাহ্যসৌন্দর্য্যে পশুপতিকে বশীভূত করিতে যান নাই। দেবতা-দিগের নিজের প্রয়োজন ছিল। তাহারাই স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাহ্য-জগতের সৌন্দর্য্যের সাহায্যে—মদনের সাহায্যে মহাদেবকে প্রেমাসক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা নিষ্ফল হইয়াছেন। এই ঘটনা দ্বারা একথাও বুঝিতে হইবে যে, রমণী যদি নিজেও এইরূপ রূপের মোহে, পুরুষকে মোহিত করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার চেষ্টাও এইরূপ বিফল হইবে। কেবল হরপার্ব্বতীর প্রেমের আদর্শে যে পবিত্র প্রেমের বিকাশ হইবে তাহাই চিরস্থায়ী হওয়ার সম্ভব।

এই আদর্শনারী উমার ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী হইবার জন্যই আমাদের দেশের কুমারীকন্যারা অতি শৈশব হইতেই শিবপূজার ব্রত করিয়া থাকে। তাহারা সুকুমারদেহে উপবাসাদি অনেক

ক্লেশ সহ্য করিয়া ব্রতনিয়মাদির অনুষ্ঠান করে। ইহাতে চিত্ত-শুদ্ধি হয়, মনোবৃত্তিগুলির বিকাশ হইয়া থাকে। ইহা পার্ব্বতীর তপস্যার একপ্রকার অনুকৃতি। এগুলির অধিকাংশের উদ্দেশ্য শিবের মতন বর পাওয়া, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া আদর্শ-পত্নী হওয়া। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ কুমারীদিগের এই সকল ব্রতনিয়মাদি ক্রমশঃ দেশ হইতে অন্তর্হিত হইতেছে। এগুলির পুনরুজ্জীবন আবশ্য প্রার্থনীয় হইয়াছে। এগুলি স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার প্রাণভূত অঙ্গ স্বরূপ। অহঙ্কার, অভিমান, কাম ক্রোধ প্রভৃতি পরিহার করিতে হইলে যমনিয়মাদির আবশ্যক। নীরস বিদ্যালয়ের ধর্ম্মহীন শিক্ষায় কোনই সুসার হয় না। সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিলে দুর্জ্জয় ভোগবাসনারিপুর সহিত সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। কি নারী, কি পুরুষ সকলেরই এই জন্য গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই যাহাতে চিত্তশুদ্ধি হয় তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা কর্ত্তব্য। পুরুষের প্রথমাশ্রম এইজন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। নারীরও কর্ত্তব্য গৌরীর ন্যায় তপস্বিনী হওয়া। তাহা না হইলে দুর্জ্জয়বাসনারিপুর হস্তে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই কঠিন। এই কাম মহাবৈরী। তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, “জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্”। ইহাই মদনভস্মের অর্থ।

অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা।

ভগবানের সৃষ্টিতে যেমন ক্ষুদ্র পুষ্পরেণু, তৃণকণা প্রভৃতিও অতি প্রয়োজনীয় এবং তাঁহার অনন্ত কৌশলের পরিচায়ক, মহাকবির কাব্যের অতি ক্ষুদ্রাংশও সেইরূপ অত্যাবশ্যকীয় এবং কবির শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করে। প্রকৃত কাব্যের প্রত্যেক অংশই পরম সুন্দর ও মনোরম এবং কাব্য-বর্ণিত প্রত্যেক চিত্রই সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র। শ্রেষ্ঠ কবি চরিত্র-অঙ্কণে মহামহিমময় বিশ্বনির্ম্মাতারই অনুকারী। তাঁহার কাব্যের নায়ক নায়িকা ও অন্যান্য প্রধান চরিত্র ত অতুলনীয়। তাঁহার অপর চিত্রগুলিও অতিশয় উজ্জ্বল এবং বিশেষ পর্য্যালোচনার বিষয়। আমরা এইরূপ দুটী ছোট চিত্রের বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

"অভিজ্ঞান-শকুন্তলের" অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা দুটী বড় মনোহর উজ্জ্বল চিত্র। ইহাঁরা শকুন্তলার প্রিয়সখী, বুঝি এরূপ সখীচরিত্র জগতের কোন নাটকে, কোন কাব্যে নাই। Shakespere এর কোন কোন নাটকে এইরূপ উজ্জ্বল সখীচরিত্র দেখা যায় বটে, কিন্তু বিদেশী চিত্র বলিয়া হউক অথবা প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয় বলিয়া হউক, আমাদের নিকট তাহার মাধুর্য্য তত প্রস্ফুট নয়। "Merchant of Venice" এর Portiaর সহচরী Nerrisa, "As you like it" এর Celia, "Much ado about nothing" এর Beatrice প্রভৃতি এইরূপ চিত্র। উভয় মহাকবি বোধ হয় একই উদ্দেশ্যে এইরূপ সখীচিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। উদ্দেশ্য, সখীচরিত্রের দ্বারা নায়িকাকে অথবা অন্য প্রধান চরিত্রকে সমধিক বিকশিত করা। এই সকল সখী

চরিত্রে যেমন একদিকে নায়িকার অত্যুজ্জ্বল চিত্রের কতক ছায়া পড়িয়াছে, সেইরূপ, এই সখীদের চিত্রের দ্বারা নায়িকার চিত্রের কতক অংশও বুঝিয়া লইতে হইবে। যাঁহার সখীরা এমন, তিনি নিজে জানি কত বড়। উপন্যাসকারের ন্যায় নাটককারের নিজের কিছু মতামত প্রকাশ করিবার সুবিধা নাই। তাঁহার কাজ বড় শক্ত। তাঁহাকে সংক্ষেপের মধ্যে কেবল স্ব-অঙ্কিত চিত্রের দ্বারাই সমস্ত কথা ব্যক্ত করিতে হইবে। কেবল নায়িকার কার্য্যদ্বারা তাঁহার চিত্র পরিস্ফুটিত করিতে হইলে অনেক ঘটনা-বাহুল্য হইয়া পড়ে; তাহা কয়েকটীমাত্র অঙ্ক-পরিমিত নাটকে সম্ভবে না। এই জন্য নাটককার একটী চিত্রের দ্বারা অপর একটী চিত্রের বিকাশ প্রকটিত করেন। আমাদের দেশে যে দেবতার প্রতিমা গড়িবার প্রথা আছে, তাহাতেও কতকটা এইরূপ কারিকুরি দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল দেবতারা একলা আসেন, অর্থাৎ দুর্গাঠাকুরাণীর মত ছেলে পিলে ও ঠাকুরটি সঙ্গে করিয়া আসেন না, তাঁহাদের প্রতিমা গড়িবার সময় কারিকরেরা প্রায়ই দুপাশে দুটী সখী-মূর্ত্তি গড়িয়া দিয়া থাকে। জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী অথবা সরস্বতী দেবীর প্রতিমা এইরূপ সখীসমেতা। এখানেও সেই মহা উদ্দেশ্য। একটীমাত্র মূর্ত্তি সমাধিক সমুজ্জ্বলা হইলেও কেমন নেড়া নেড়া দেখায়। সেইজন্য দুইটী পার্শ্ববর্ত্তিনী সখীমূর্ত্তির প্রযোজন। যাঁহার সখীরা এরূপ, তিনি নিজে জানি কেমন। কখন কখন কবিরা এইরূপ সখী-মূর্ত্তি সৃষ্টি না করিয়া বিভিন্ন প্রকারের নায়িকা-চরিত্রের অবতারণা করেন। সেক্ষপিয়রে প্রায়ই এইরূপ আছে। একজন প্রধানা সর্ব্বগুণবতী; অপরেরা তাঁহার আলোকে আলোকময়ী অথচ নিজস্ব-বিশিষ্ট বিভিন্ন চিত্র। বঙ্কিম বাবু এই-

রূপ প্রধানা নায়িকার সঙ্গে বহুনায়িকার সৃষ্টি করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার প্রফুল্লের সঙ্গে সাগরবৌ ও নিশা আছে। সীতারামের শ্রী, নন্দা ও রমার সমষ্টি এবং আরো কিছু। সমষ্টি কথটা ঠিক নয়। একজন প্রায় Perfect woman, অপরেরা অসম্পূর্ণা; তাঁহাদের শারীরিক অথবা মানসিক বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ রূপে বিকশিত নহে। আমরা 'শকুন্তলার' প্রথমাঙ্কেই অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার দর্শন পাই। দুষ্যন্ত বিনীত বেশে মহর্ষি কণ্বের শান্ত আশ্রমপদে প্রবেশ করিয়াই শকুন্তলার মধুর আলাপ শুনিতে পাইলেন। তার পরই দেখিলেন, শকুন্তলা সখী দুটীর সঙ্গে ছোট ছোট কলসী লইয়া ছোট ছোট গাছে জলসেচন করিতেছেন। শকুন্তলা সখীদের কাছে ডাকিলেন। প্রথমেই অনসূয়া কথা কহিলেন, বলিলেন, "সখি শকুন্তলে, তোমার চেয়ে বুঝি পিতা কাশ্যপের এই আশ্রমবৃক্ষদের উপর বেশী স্নেহ; তুমি নবমালিকা ফুলের মতন কোমল; তোমাকেও তিনি আলবালপূরণে নিযুক্ত করিয়াছেন"। শকুন্তলা জবাব দিলেন, "পিতার আদেশ বটে; কিন্তু আমারও এই তরুগুলির উপর ভ্রাতৃস্নেহ আছে"। বৃক্ষ লতাকে যে এত ভাল বাসিতে পারে, না জানি সে মানুষকে কত ভালবাসে। অতিপিনদ্ধ-বল্কলে প্রিয়ম্বদা শকুন্তলাকে নিপীড়িত করিয়াছিল। অনসূয়া শকুন্তলার কথায় আঁটা বল্কল একটু আল্‌গা করিয়া দিল। এই অবসরে প্রিয়ম্বদা মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "দোষ আমার না তোমার পয়োধরবিস্তারয়িতৃ যৌবনের।" এইখান হইতেই অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার চরিত্রের প্রভেদ দেখিতে পাই। অনসূয়া সাদাসিদে, বালিকা-প্রকৃতি, সোজাসুজি বুঝে। শকুন্তলার হুকুম হইলে, সোজাসুজি বল্কল

খুলিয়া দিল। প্রিয়ম্বদা কৌতুকপ্রিয়; অবসর পাইলেই একটু মস্কারা করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারে না। শকুন্তলা যত্নরক্ষিত বকুলের চারার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। অমনি প্রিয়ম্বদা বলিয়া উঠিল "একটু দাঁড়াও সখি; ওইখানে একটু থাক; তোমাকে প্রাণ ভরিয়া দেখি, আমার মনে হইতেছে যেন ক্ষুদ্র বকুল এক্ষণে লতাসমাগত হইল"। প্রিয়ম্বদা বড় প্রত্যুৎপন্নমতি। শকুন্তলাও তখনি বলিলেন, "সখি, এই জন্তই তোমার নাম প্রিয়ম্বদা"। বাস্তবিকই মহাকবি যেন বাছিয়া বাছিয়া সখীদুটীর সার্থক নাম রাখিয়াছেন। প্রিয়ম্বদার মতন, প্রিয়কথা এমন করিয়া বলিতে যেন আর কেহ পারে না। প্রিয়ম্বদার এটা প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা। অনসূয়ার নামটাও সার্থক। অনসূয়ার নামকরণের সময় বোধ হয় মহাকবি মহাপ্রভাব মহর্ষি অত্রির ধর্ম্মপত্নীর কথা স্মরণ করিতেছিলেন। এই তপঃপ্রভাব-শালিনী বিদুষী অনসূয়ার কথা আর এক জায়গায় উল্লেখ করিয়াছেন।

"প্রবর্ত্তয়ামাস কিলানুসূয়া
ত্রিস্রোতসংত্র্যম্বকমৌলিমালাম্।" রঘু।

ইহাঁরই ছায়া, শকুন্তলা-সখীতে বেশ প্রতীয়মান হয়। পুনরায় যখন অনসূয়া নবকুসুমযৌবনা, শকুন্তলাদত্ত বনজ্যোৎস্না-নামধারিণী নবমালিকা লতিকার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন এবং শকুন্তলা লতিকা ও সহকার তরুর রমণীয় সমাগমে উল্লাসিত হইয়া নয়ন ভরিয়া তাহাদের দেখিতে লাগিলেন, অমনি প্রিয়ম্বদা অনসূয়াকে বলিলেন "অনসূয়ে, বলিতে পার, শকুন্তলা কেন লতা-পাদপমিথুনকে অত করিয়া দেখিতেছে"। অনসূয়া অত শত বোঝে না, বলিল "আমিত জানি না; তুমি বল দেখি।" প্রিয়ম্বদা বলিয়া উঠিল "শকুন্তলার ইচ্ছা, বনজ্যোৎস্না যেমন অনুরূপ তরু

সমাগতা হইয়াছে, আমিও যেন তেম্নি মনের মতন বর পাই।” আমাদেরও যেন মনে হয়, শকুন্তলার সহিত একমত হইয়া বলি “প্রিয়ম্বদে, এটা তোমার আত্মগত মনোরথ।” কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়; এইরূপ বলিতে পারাই প্রিয়ম্বদার প্রকৃতি। প্রিয়ম্বদার কথাটা কিন্তু খাটিয়া গেল। মহাকবিরা “Coming events cast their shadows beforehand” এ কথাটা বড় মানিয়া চলেন। ভ্রমর-পীড়িতা শকুন্তলাকে দুজনেই দুষ্যন্তের শরণ নিতে বলিলেন। এই পরিহাসও পূর্ব্বোক্ত কবিকৌশলের অঙ্গীভূত। এই কবিতাময় ভ্রমর-তাড়না প্রসঙ্গেরও বিশেষ অর্থ আছে। ইহা দ্বারা শকুন্তলার ভাবি অমঙ্গলের সূচনা হইল। দুষ্যন্তই এই ভ্রমর। কিছুদিনের জন্য প্রিয়তমা পত্নীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। মুগ্ধস্বভাবা তাপস-বালিকাদের ছেলেবেলায় যেমন ভ্রমরতাড়না আছে, মধুর প্রণয়েও তেমনি কিছু দিনের জন্য অভিশাপ আছে।

রাজা অবসর বুঝিয়া দেখা দিলেন। সখীরা চকিত হইল। কিন্তু তখনি অনসূয়া রাজার সহিত কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন, বলিলেন “আর্য্য, বেশী কিছু হয় নাই, আমাদের প্রিয়সখীকে একটী মধুকর কিছু কষ্ট দিতেছিল।” অনসূয়া সাদাসিদে বলিয়া মনে কোন দ্বিধাভাব করে না, সকলের আগে কথা কহিতে পারে, কোন ভয় করে না। তিনজন সখীই বুদ্ধিমতী; কিন্তু অনসূয়ার বুদ্ধি কিয়ৎ পরিমাণে অধীত গ্রন্থাদি হইতে সংগৃহীত। এই বুদ্ধি Practice এর সহিত ক্রমশঃ মিশিলে চিরস্থায়িনী ও প্রকৃত কার্য্যকরী হইবে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তপস্যা বেশ চলিতেছে ত? অনসূয়াই রাজাকে সম্মানিত করিয়া বলিলেন, “এক্ষণে অতিথি-বিশেষ লাভে তপস্যা সংবর্দ্ধিত হইল” এবং

শকুন্তলাকে কুটীরে গিয়া ফলাদি অর্ঘ্য আহরণ করিতে বলিলেন। রাজা অত গোলমালে গেলেন না, বলিলেন, "আপনাদের মধুর বাক্যেই আমার আতিথ্যসৎকার হইয়াছে।" এইবার প্রিয়ম্বদা কথা কহিলেন এবং রাজাকে সুশীতল ছায়াযুক্ত সপ্তপর্ণবেদিকায় উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজাও তাহাতে অনুমোদন করিলেন। অনসূয়া বলিলেন, "অতিথির অনুরোধ রক্ষা করা সকলের উচিত, অতএব এস আমরা সকলে বসি।" তারপর সকলে বসিলেন।

এইখানেও অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার বিভিন্ন প্রকৃতি বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। অনসূয়া প্রিয়ম্বদার মতন ঠাট্টা করিতে পারে না, কিন্তু তাহার এক অপূর্ব্ব রমণীয় সরলতা আছে এবং তাহার হৃদয়ে এক অভিনব প্রকার সাহস আছে। ইহা তপোবন-সুলভ মুগ্ধস্বভাবের এবং কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষার ফল। প্রিয়ম্বদার কথা ফোটে সখীদের কাছে, এবং কদাচিৎ তিনি অন্যত্র কৌতুক করিতে পারেন। কিন্তু তাহা আগে নয়, হঠাৎ নয়; আগে কিঞ্চিৎ পরিচিত না হইলে তিনি সলজ্জভাবে চুপ করিয়া থাকেন। প্রিয়ম্বদা একটু বেশী সংসারাভিজ্ঞ ও লোকচরিত্রজ্ঞ। এই টুকুই তাঁহার বিশেষ গুণ। তিনি অনসূয়া অপেক্ষা বয়সে বড় নহেন। রাজাই বলিয়াছেন "অহো সমবয়োরূপরমণীয়ং ভবতীনাং সৌহার্দ্যম্"। তাঁহাদের তিনজনেরই সমান রূপ সমান বয়স ও সমান সখীপ্রীতি। কিন্তু ক্রমে আমরা অনসূয়াকে উজ্জ্বলতর বলিয়া দেখিতে পাই। প্রিয়ম্বদা আগে রাজার সহিত কথা কহিতে পারিলেন না, আড়ালে থাকিয়া রাজার ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিতে-ছিলেন এবং অনসূয়াকে বলিলেন "এই মধুরগম্ভীরাকৃতি চতুর-প্রিয়ালাপী প্রভাববান্ লোকটী কে?" কিন্তু রাজাকে স্বয়ং কিছু

জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না! অনসূয়া বলিল, "আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি" এবং বেশ মিষ্টি মিষ্টি করিয়া রাজার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। এই সাহসটুকু, সরলতা ও পবিত্র ভাব-জনিত এবং এই টুকুই অনসূয়ার নিজস্ব। এইজন্য অনসূয়াই শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত রাজাকে শোনাইলেন এবং প্রায় বিশ্বামিত্র-মেনকা-সম্বলিত বৃত্তান্ত সবটুকু বলিয়া ফেলিয়াছিলেন আর কি। কেবল বালিকা-সুলভ লজ্জা আসিয়া কিঞ্চিৎ বাধা জন্মাইল। প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়ার চরিত্রগত পার্থক্য অন্যত্র এক জায়গায় বেশ প্রতীয়মান। শকুন্তলা মদনসন্তাপে পীড়িতা, সখীরা ঠিক জানে না, কি হইয়াছে। তিনি শিলাখণ্ডোপরি পুষ্পময়ী শয্যায় শয়ানা। সখীরা নলিনীপত্রে তাঁহাকে বীজন করিতেছে। প্রিয়ম্বদা অনসূয়াকে বলিলেন, সখি, সেই রাজর্ষির প্রথম দর্শন হইতেই শকুন্তলা এইরূপ হইয়াছে; সেই জন্যই কি এই ব্যাধি?" প্রিয়ম্বদা অবস্থাটা কতক বুঝিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজে শকুন্তলাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। অনসূয়া বলিলেন "আমারও তাই মনে হয়; ভাল, শকুন্তলাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি" এবং তৎক্ষণাৎ শকুন্তলাকে সন্তাপের কারণ জিজ্ঞাসা করি-লেন। এই প্রশ্নের ভিতরও বড় নূতনত্ব আছে। অনসূয়া বলি-তেছেন "শকুন্তলে, আমি অথবা প্রিয়ম্বদা মদন-রহস্যের কিছুই জানি না; কিন্তু উপাখ্যানগ্রন্থে পূর্ব্বরাগ-যুক্তা কামিনীদিগের যেরূপ অবস্থা শোনা যায়. তোমার অবস্থা সেই রকম দেখিতেছি, এখন বল তোমার কিসের সন্তাপ। ব্যাধির অবস্থা ঠিক না জানিয়া প্রতিকার আরম্ভ করা যায় না।" এক্ষণে কেহ বলিতে পারেন যে আজ কালকার Sweet girl-gràduatesদের মতন অনেক Novel পড়িয়া অনসূয়া বড় ভাবপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু অনসূয়ার কোন কাজই sentiment (ভাব) প্রণোদিত নহে। অনসূয়া আবশ্যক মত সব কাজই করিয়াছে, শকুন্তলা ও প্রিয়ম্বদার কাজে সর্ব্বদা সহায়তা করিয়াছে; এবং প্রিয়ম্বদা দ্বারা যে কাজ হয় না, তাহাও করিয়াছে। সংসারে প্রবেশ করিলে অনসূয়া প্রিয়ম্বদা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ হইবে।

নাটকে আমরা যতটুকু দেখিতেছি, তাহাতে আমরা আপাততঃ প্রিয়ম্বদাকেই লোক চরিত্র-জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ দেখিতেছি। রাজা কয়েক দিন ধরিয়া তপোবনে অবস্থান করিতেছেন। তিনি যে রাজা দুষ্মন্ত, তাহাও সখীদিগের গোচর হইয়াছে। মাঝে মাঝে হয়ত রাজাও সখীদের নয়নগোচরে পড়িয়াছেন। এইজন্য প্রিয়ম্বদা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে, দুষ্মন্ত অন্তরতাপে দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়াছেন, এবং তাঁহার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে শকুন্তলা প্রাপ্তির অভিলাষ বোঝা যায়। এইজন্য প্রিয়ম্বদাই, রাজাকে প্রণয়-পত্র লেখার প্রস্তাব করিলেন। এ বুদ্ধি হয়ত অনসূয়ার হইত না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, অনসূয়ার সংসারাভিজ্ঞতা ক্রমে কিছু বাড়িতেছে। রাজা গান্ধর্ব্ব বিধানে শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া হস্তিনায় ফিরিয়া গিয়াছেন। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার এক্ষণে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি পড়িল। অনসূয়ার ভয় হইল, পাছে রাজা তপোবন-পরিণয় বৃত্তান্ত ভুলিয়া যান। কিন্তু প্রিয়ম্বদা বলিলেন "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক; অমন মধুর আকৃতি গুণবিরোধী হইতে পারে না।" কথাটা বাস্তবিক ঠিক। কেবল দুর্দ্দৈব বশতঃ রাজা কিছু দিনের জন্য শকুন্তলাকে ভুলিয়া গেলেন। প্রিয়ম্বদার ভয় তাত কণ্ব আসিয়া সব শুনিয়া না জানি কি করেন। অনসূয়া বলিলেন, সে বিষয়ে কোন ভাবনা নাই এবং যুক্তিবলে বুঝাইয়া দিলেন, পিতা কণ্ব দোষ ভাবিবেন না। যুক্তি এই, গুণবান্ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান

করিতে হইবে ; দৈব যখন সেই সুবিধা করিয়া দিল, তখন গুরুজন বিনা আয়াসে কৃতকার্য্য হইলেন। প্রিয়ম্বদার Practical wisdom থাকিলেও এতটা ভাবিয়া দেখে নাই। অর্জ্জিত বিদ্যা কাজে লাগাইতে পারিলেই তাহার গৌরব বর্দ্ধিত হয়। অনসূয়ার পুঁথিপড়া বিদ্যা ক্রমশঃ কাজে লাগিতেছে। অনসূয়ার কথাই শেষে ঠিক হইল। অনসূয়া বুঝি মহর্ষি কণ্বেরও একটু প্রিয়পাত্রী ; অথবা একটু বিদুষী বলিয়া মহর্ষি মধ্যে মধ্যে তাহার মান বাড়াইতেন। শকুন্তলা তপোবন ছাড়িয়া যাইবার সময় যখন দুই সখীই কাঁদিতেছিলেন, তখন মহর্ষি কেবল অনসূয়াকেই সম্বোধন করিয়া বলিলেন "কাঁদিও না। তোমাদের দুজনের উচিত শকুন্তলাকে শান্ত করা।" শকুন্তলা পতিগৃহে চলিয়া গেলে, কণ্ব কেবল অনসূয়াকেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "অনসূয়ে, তোমাদের সহধর্ম্মচারিণী সখী চলিয়া গেল ; শোক পরিত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আইস।" শকুন্তলা উভয়কে তুল্য ভাল-বাসেন। তাঁহারা উভয়েও শকুন্তলার জন্য প্রাণ দিতে পারেন। শকুন্তলা সখীদের বলিলেন, "তোমরা দুজনেই এক সঙ্গে আমাকে আলিঙ্গন কর!" উভয়ে তাহাই করিলেন। কি মধুর মিলন হইল। যেন হরগৌরী মিলন হইল। তিনটী সখীতে মিশিয়া যেন এক হইয়া গেল। শকুন্তলা যেন উভয়কে সঙ্গে লইয়াই পতিগৃহে গমন করিলেন। শকুন্তলা হস্তিনায় চলিয়া গেলে আমরা আর তাঁহার সখীদের দর্শন পাই না। দুজনেই মুগ্ধা তাপসকন্যা, স্নিগ্ধলাবণ্যময়ী, সখীগতপ্রাণা এবং প্রখরবুদ্ধি-শালিনী ; তথাপি উভয়ের চরিত্রগত পার্থক্যও বিস্তর। এক-জন সরলতা এবং অন্তঃকরণের পবিত্রভাবে জ্যোতির্ম্ময়ী—সংসারের অভিজ্ঞতা ক্রমে শিখিতেছেন ; আর একজন মধুরিমা-

ময় বালিকাস্বভাবের সহিত পর্য্যবেক্ষণ শক্তি‍র (power of observation) অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ করিয়াছেন—সংসারের কোলাহলে না থাকিয়াও সংসারের জিনিস তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে শিখিয়াছেন। একজন মন্দাকিনী বারি-বিধৌত পবিত্র পারিজাত কুসুম অপর জন নন্দন-কানন-সম্ভব মধুর-সরস-দ্রাক্ষাফল। উভয়েই দেব-দুর্লভ রমণীয়তায় পরিবৃত। একজন ঋষিকণ্ঠোচ্চারিত ছন্দোবদ্ধ বেদমন্ত্র, অপর জন মনোমুগ্ধকর অপ্সরঃকণ্ঠবিনিঃসৃত তান-মান-লয়-শুদ্ধ অপূর্ব্ব আরাধনা-সঙ্গীত। এরূপ চিত্র কেবল মহাকবির তুলিকায়ই অঙ্কিত হইতে পারে।

মহাকবি অনসূয়ার নামটীও বেশ তাঁহার চরিত্রের ন্যায় সরল রাখিয়াছেন। নামে যুক্তাক্ষর নাই। সহজেই উচ্চারণ করা যায়। বোধ হয়, অনসূয়া আকৃতিতেও কৃশাঙ্গী। প্রিয়ম্বদা বোধ হয় গুর্ব্বিণী ছিলেন। অভিনয় কালে রঙ্গমঞ্চে চেহারার পার্থক্য না রাখিলে বোধ হয় চরিত্রগত পার্থক্য তত পরিস্ফুট হইবে না।

প্রিয়ম্বদা লোকচরিত্র এত জানেন যে, তিনি যেন লোকের চেহারা দেখিয়াই তাহার মনের সব কথাগুলি বলিয়া দিতে পারেন। অনসূয়ার মুখে শকুন্তলাসম্ভব বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজাও বলিয়া উঠিলেন, এরূপ আলৌকিক রূপলাবণ্য মানুষীতে সম্ভবে না, ভূগর্ভ হইতে জ্যোতির্ম্ময় বিদ্যুতের উদয় হয় না। শকুন্তলা লজ্জায় অধোমুখী হইলেন। রাজাও লতাপাদপমিথুন সম্বন্ধীয় পরিহাসের কথা মনে করিয়া ভাবিলেন, বুঝি বা শকুন্তলার আর কেহ অভিলষিত বর আছে, এবং চুপ করিয়া রহিলেন। প্রিয়ম্বদা এইবার রাজার মনের কথা টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন; বলিলেন, "মহাভাগ যেন আরো কিছু বলিতে

চাহেন"। শকুন্তলা, ব্যাপারটা কোথায় গড়াইবে বুঝিতে পারিয়াই, প্রিয়ম্বদাকে আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া দিলেন। প্রিয়ম্বদা ছাড়িবার পাত্রী নহেন। তাঁহার সুযোগ পড়িয়াছে। রাজা তাই সন্দেহ দূর করিবার জন্য শকুন্তলার বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অমনি প্রিয়ম্বদা বলিলেন "শকুন্তলা চিরকুমারী থাকিবেন, কি পরে বিবাহ করিবেন, এ বিষয়ে ইঁহার স্বাধীনতা নাই, ধর্ম্মাচরণেও ইনি পরবশ, কিন্তু পিতার সঙ্কল্প ইঁহাকে অনুরূপ পাত্রে সম্প্রদান করিবেন।" প্রিয়ম্বদার জবাবটা যেন একটু অসম্বদ্ধ (irrelevant) কিন্তু ইহা তাঁহার চরিত্রের অনুরূপ হইয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা যেন গান্ধর্ব্ব বিবাহটা প্রথম মিলনের দিনই হইয়া যায়। শকুন্তলা এবার সত্য সত্যই রাগিয়া অনুসূয়াকে বলিলেন "আমি চলিলাম, এই অসম্বদ্ধপ্রলাপিনী প্রিয়ম্বদার কথা আর্য্যা গৌতমীকে বলিয়া দিব"। কোন্ অনূঢ়া বালিকা এরূপ অবস্থায় রাগ না করে? সম্মুখে একজন বহুগুণশালী যুবাপুরুষ উপস্থিত; চাহি কি তিনিই হয়ত ভাবী পতি হইবেন; এরূপ লোকের সমক্ষে কৌতুকপ্রিয়া সখী বিবাহের কথা লইয়া ঠাট্টা করিতেছেন, ইহা সহ্য হয় না। প্রিয়ম্বদা এরূপ অবস্থায় কি করিত, জানি না। কিন্তু অনসূয়া বোধ হয়, কোন কথাটী না বলিয়া ছুটিয়া পলাইত। কিন্তু নিজের বেলায় যাই করুক, শকুন্তলা যে হঠাৎ এমন অবস্থায় চলিয়া যায়, ইহা অনসূয়ার ইচ্ছা নয়। একটা ছোট খাট বুদ্ধি ঠিক করিয়া বলিল "সখি, অতিথি-সৎকার—এখনও হয় নাই; এরূপে তাঁহাকে ফেলিয়া হঠাৎ যাওয়া উচিত হয় না।" বড় সরল-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াই অনসূয়া একথা বলিল। এত সহজে শকুন্তলাকে ফেরান যায় না। তিনি উঠিয়া চলিলেন। এইবার প্রিয়ম্বদার পালা। প্রিয়ম্বদা এক নিমেষে বুঝিয়া লইলেন, কি

করিতে হইবে। যেন কিছুই হয় নাই ; হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শকুন্তলা. চলিয়া যাওয়াটা ভাল দেখায় না।" শকুন্তলা ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিলেন "কেন ?" অমনি প্রিয়ম্বদা বলিয়া উঠিলেন "আমার বৃক্ষ সেচনের দু কলসী জল ধার, শোধ দিয়া যাও" এবং জোর করিয়া শকুন্তলাকে আটকাইলেন। মরি ! কি মধুর সরলতা ! কি মধুর কলহ ! এ বুঝি কেবল মালিনীতীরের শান্ত তপোবনেই আছে, ত্রিভুবনের আর কোথাও নাই। বালিকা স্বভাবের সহিত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কি মধুর সংমিশ্রণ ! প্রিয়ম্বদা বড় বুদ্ধিমতী ! মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে উপদেশ দিবার সময় বলিয়াছিলেন, "আমরা বনবাসী হইলেও লৌকিকবৃত্তান্ত জানি।" মহর্ষির এই লৌকিক জ্ঞানের ছায়া কিয়ৎপরিমাণে প্রিয়ম্বদার উপর পড়িয়াছে। আশ্রমে লালিত পালিত হইয়াও তাঁহার সংসার-জ্ঞান অনেকটা হইয়াছে। রাজা ক্ষণকালের জন্য রাজ-গাম্ভীর্য্য ভুলিয়া গেলেন ; বালিকাদের ছেলে খেলায় যোগ দিলেন। "বৃক্ষ সেচনে ইনি বড় শ্রান্ত হইয়াছেন ; আমি ইঁহাকে ঋণমুক্ত করিতেছি" এই বলিয়া নাম-মুদ্রাযুক্ত অঙ্গুরী দিতে উদ্যত হইলেন। সখীরা দুষ্যন্তের নাম দেখিয়া মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। রাজা কিঞ্চিৎ ছল করিয়াই নিজের পরিচয় প্রদান করিলেন। প্রিয়ম্বদাও তাঁহাকে প্রিয় বচনে সন্তুষ্ট করিলেন এবং শকুন্তলাকে ছেড়ে দিয়া বলিলেন, "যাও এবার" ; মনে মনে বুঝিলেন, পাখী এবার কলে পড়িয়াছে। শকুন্তলার প্রকৃত অবস্থা তাহাই ; বলিলেন, "তুমি আমাকে ছাড়িয়া দিবারই কে আর ধরিয়া রাখিবারই বা কে ?" বোধ হয় এই প্রথম দিনেই গান্ধর্ব্ব বিবাহটা হইয়া যাইত। একটা আরণ্য গজ ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণে কিঞ্চিৎ বাধা

জন্মাইল। পৃথিবীতে এইরূপই হইয়া থাকে। মহাকবির কৌশলও ইহাই দেখাইতেছে। অনসূয়া বাড়ী যাইবার জন্য রাজার নিকট অনুমতি চাহিলেন। সখীরা আস্তে আস্তে আশ্রমের দিক চলিলেন এবং তপস্বিজনসুলভ বিনয়ের সহিত রাজার পুনর্দ্দর্শনের জন্য আমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। সমুচিত অতিথি-সৎকার হয় নাই বলিয়া তাঁহারা লজ্জা প্রকাশ করিলেন।

পুনরায় তৃতীয়াঙ্কে আমরা এই লাবণ্যময়ী তিনটী সখীমূর্ত্তির দর্শন পাই। এবার বালিকারা বড় বিষম সমস্যায় পড়িয়াছে। এবার আলবালের জলপূরণ নহে, ছেলেখেলা নহে একবার জীবন মরণের বিষম খেলা। একজন ভগবান্ কুসুমশরের অমোঘবাণে বিদ্ধ, অপর দুজন অলক্ষিত শরক্ষেপ বুঝিতে না পারিয়া উশীর(১) লেপন ও নলিনীপত্রবাতে সন্তাপিতার শুশ্রূষা করিতেছেন। সহসা প্রিয়ম্বদা আলোক দেখিতে পাইলেন; অনসূয়ার সাহায্যে আসল কথাটা বুঝিতে পারিলেন। তখন দুজনে মনে মনে বড় সন্তুষ্ট হইলেন। মহানদী সাগরে যাইবে, অতিমুক্ত লতা সহকারে আশ্রিতা হইবে। প্রিয়সখীদের কাছে ইহা অপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি আছে। উপযুক্ত পাত্রে শকুন্তলার অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া সখীরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার অভিলাষের অনুমোদন করিলেন। বিশাখা নামধারিণী দুটী তারকা শশাঙ্কলেখার এইরূপ অনুসরণ করিয়া থাকে। এই মনোজ্ঞ উপমা দ্বারা কবি নিজে এই তিনটী বালিকার চিত্র সুন্দররূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন। শকুন্তলার চিত্র চন্দ্রবিম্বের ন্যায় উজ্জ্বল মধুর; আর সখীরা তাঁহারই আলোকে আলোকময়ী হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়া থাকেন।

---

(১) খস্ খস্।

এক্ষণে কিসে নায়ক নায়িকার অবিলম্বে মিলন হইবে, নিপুণা বর্ষীয়সীর ন্যায় উভয় সখীই তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। প্রিয়ম্বদার প্রখরবুদ্ধি ও অনসূয়ার দৃষ্ট সংসারজ্ঞান শীঘ্রই উপায় আবিষ্কার করিয়া দিল এবং দৈবও তাঁহাদের সাহায্য করিলেন। প্রিয়ম্বদা মদনলেখার প্রস্তাব করিলেন; পুষ্পমধ্যগত করিয়া কি উপায়ে পত্র পাঠাইতে হইবে, তাহাও বলিয়া দিলেন। শকুন্তলার লিখিবার উপকরণ নাই; অমনি প্রিয়ম্বদার উপস্থিত বুদ্ধি বলিয়া দিল সুকুমার নলিনীপত্রে নাম লিখিলেই চলিবে। শকুন্তলা এই সুবুদ্ধি মন্ত্রীটার মন্ত্রণা মত কাজ করিলেন এবং প্রণয়লেখার মর্ম্ম দুজনকেই শোনাইলেন। অমনি রাজা অন্তরাল হইতে দর্শন দিলেন। সখীরা হাতে আকাশ পাইলেন; কার্য্যসিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী দেখিয়া আনন্দে গদ্‌গদ হইলেন। অনসূয়া রাজাকে আর একবার অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি এবার রাজাকে এক অভিনব নামে সম্বোধন করিলেন; বলিলেন "বয়স্য, এই শিলাতলে উপবেশন করুন।" এই মধুর সম্বোধন অনসূয়ারপ্রকৃতির আর এক অংশ বড় উজ্জ্বল রূপে প্রস্ফুটিত করিয়াছে। দুষ্যন্ত মহাপ্রতাপশালী রাজাধিরাজ, তিনি পৌরবদের ললামভূত। কিন্তু এসব জানিয়া শুনিয়াও অনসূয়া আর তাঁহাকে "মহারাজ" অথবা পূর্ব্বের ন্যায় "আর্য্য" বলিয়া সম্বোধন করিলেন না। একেবারেই রাজাকে বয়স্য করিয়া ফেলিলেন। জানি না, সেকালে ভগ্নীপতিকে বয়স্য বলিত কিনা। কিন্তু এই আত্মীয় সম্বোধনটা বড় অসম সাহসের। অনসূয়ার মন অতি পরিষ্কার, অতি পবিত্র; তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। উপযুক্ত অবসরে রাজা আসিয়া উপস্থিত; অনসূয়ার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ইনি এক্ষণে মহারাজ্যেশ্বর হইলেও প্রিয়সখী শকুন্তলার ভাবী হৃদয়রাজ্যেশ্বর। তাই মূহূর্ত্ত

মধ্যে একথাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিলেন। কবিরা প্রতিভাবলে অনেক সময়ে যুক্তির আশ্রয় না করিয়াও সত্যের দর্শন পান। অনসূয়ার সরল চরিত্রের এইরূপ একটী ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা আছে; সংসারাভিজ্ঞা না হইলেও, তিনি আসল তথ্যে উপনীত হইতে পারেন। নিজের সরল বিশ্বাসবলে তিনি উপযুক্ত পরকে আপন করিয়া লইতে পারেন। তাই, এই এত বড় রাজাকে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আপনার করিয়া লইলেন। অনেক সময়ে মুগ্ধস্বভাবা রমণী অপরকে হঠাৎ বিশ্বাস করিয়া প্রতারিতা হইয়া পড়েন। কিন্তু যাঁহারা অনসূয়ার মত হৃদয়বতী ও বিদ্যাবতী, তাঁহারা কথনো ঠকেন না।

প্রিয়ম্বদা নানা পরিহাসচ্ছলে রাজাকে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিতে বলিলেন। এই সময় শকুন্তলা একটু নৈরাশ্যের সহিত বলিলেন, "রাজা অন্তঃপুরজনবিরহে কাতর, তাঁহাকে আশ্রমে আবদ্ধ করিয়া কি হইবে।" রাজা gallantryর সহিত নিজের প্রণয় জ্ঞাপন করিয়া কথটা চাপা দিতেছিলেন। কিন্তু অনসূয়া ছাড়িবার পাত্র নহেন। কথাটা অমন গোলমালে থাকা ভাল নয় মনে করিয়া অমনি বলিলেন, "বয়স্য, শোনা যায়, রাজাদের অনেক রাণী থাকে; যাহাতে আমাদের প্রিয়সখী কষ্ট না পান, তাহা করিতে হইবে।" এখানেও একটু অধীত শাস্ত্রের দোহাই; শোনা যায়, কথাটাতে তাহা প্রকাশ। কিন্তু কথাটা বড় পাকা কথা। শকুন্তলার পক্ষে ইহার নিষ্পত্তি না হইলে গন্ধর্ব্ব বিবাহ হইবে না। রাজা তখন প্রতিজ্ঞা করিলেন, কেবল সমুদ্রমেখলা ধরণীই শকুন্তলার সপত্নী হইবেন। তখন সকলে নিশ্চিন্ত হইলেন।

প্রণয়িযুগলকে প্রণয়সম্ভাষণের অবসর দিয়া প্রিয়ম্বদা অনসূয়াকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। অনসূয়া বোধ হয় ইহা পারিত

না। "চক্রবাকবধু, আমন্ত্রয়স্ব সহচরং, উপস্থিতা রজনী" এই নেপথ্যবাণীও বোধ হয় প্রিয়ম্বদার। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, অনসূয়ার কর্ম্মকুশলিতাও বড় কম নহে।

রাজা চলিয়া গিয়াছেন। অনসূয়া শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতার অর্চ্চনা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এমন সময়ে নেপথ্যে বজ্রগম্ভীর শব্দ হইল "অয়মহং ভোঃ"। অনসূয়া কাণ পাতিয়া শুনিলেন, দুর্ব্বাসা শাপ দিলেন।

"আঃ অতিথি পরিভাবিণি

বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা

তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।

স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্

কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব॥"

দুর্ব্বাসা মুনি জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায়; বেগবলোৎফুল্লগতিতে চলিয়া যাইতেছেন। প্রিয়ম্বদা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইলেন। কিন্তু অনসূয়া পরামর্শ দিলেন "যাও পায় পড়িয়া ফিরাইয়া আন, আমি পাদ্য অর্ঘ্য আনিতেছে।" প্রিয়ম্বদা যাইয়া দুর্ব্বাসাকে কিঞ্চিৎ প্রসন্ন করিলেন। হয়ত অনসূয়া একাজ পারিতেন না। কিন্তু তিনি কর্ত্তব্য বিষয়ে পরামর্শদাত্রী। দুর্ব্বাসার শাপবৃত্তান্তশ কুন্তলার অজ্ঞাত রাখিতে হইবে, এ বুদ্ধিও অনসূয়ার হইয়াছে। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি অনসূয়ার সংসারজ্ঞান ক্রমে বিকসিত হইতেছে।

পুনরায় চতুর্থাঙ্কের প্রথমে অনসূয়াকে দেখিতে পাই। এবার অনসূয়ার আর এক মূর্ত্তি। অনসূয়া এবার বড় রাগিয়াছেন। রাজা অনেক দিন হইল আশ্রম ত্যাগ করিয়া রাজধানীতে গিয়াছেন। কিন্তু শকুন্তলার কোন উদ্দেশ নেন নাই। এমন কি, এক খানি পত্রও লিখেন নাই। তাই রাজার উপর অনসূয়ার বড় রাগ। অনসূয়া সংসারিদের আচার জানে না।

তবুও অনসূয়ার মনে হইতেছে, রাজার ব্যবহার অনার্য্যের ন্যায়। "অনার্য্য" কথাটা খুব শক্ত কথা। কিন্তু অনসূয়া একবিন্দুও অসত্য বলে নাই। এরূপ আচরাণ অনার্যোচিত নয় ত কি? একদিন স্বয়ং শকুন্তলাই রাজাকে রোষভরে অনার্য্য বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন। এখানে সেই ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্ব্বাভাষ। কবি দেখাইলেন শকুন্তলার ছায়া বহুল পরিমাণে অনসূয়াতে বিদ্যমান। প্রিয়ংবদাতেও যে শকুন্তলার ছায়া নাই, তাহা নহে। সে আর এক রকমের। রাজাকে লতামণ্ডপে রাখিয়া শকুন্তলা যখন গৌতমী ও সখীদের সঙ্গে আশ্রমে ফিরিয়া যাইতেছিলেন তখন বলিয়াছিলেন, "লতাবলয়, সন্তাপহারক, আমন্ত্রয়ে ত্বাং ভূয়ঃ অপি পরিভোগায়।" এ কথাটা খাঁটি প্রিয়ম্বদার কথা বলিয়া বোধ হয়। রাজার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া অনসূয়া কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। উচিত কর্ত্তব্যেও তাঁহার হাত পা সরিতেছে না। একবার সখীর দোষ দিতেছেন, এক-বার বা মনে করিতেছেন, বুঝিবা দুর্ব্বাসার শাপ যত অনর্থের মূল। শকুন্তলারই দোষ বলিয়া তাঁহার গর্ভাবস্থার কথাও প্রবাস-প্রত্যাগত তাতকণ্বকে বলিতে পারিতেছেন না। এমন সময় প্রিয়ম্বদা আসিয়া প্রিয়সংবাদ দিলেন, তাত কাশ্যপ দৈববাণীতে সব অবস্থা জানিয়াছেন এবং যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তখন দুই সখীতে তাড়াতাড়ি করিয়া মৃগরোচনা, তীর্থ-মৃত্তিকা, দুর্ব্বাকিস-লয় প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুলেপন লইয়া শকুন্তলাকে সাজাইতে চলিলেন। এখন কেবল বিদায়ের করুণ-দৃশ্য। দুটী সখীতে এক হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সখীকে সাজাইতেছেন। শকুন্তলাও কাঁদিতে-ছেন, বলিতেছেন "দুর্লভম্ ইদানীং মে সখীমণ্ডনং ভবিষ্যতি"।

সখীদের একটু মনের দুঃখ, তাঁহাদের কাছে বহুমূল্য আভরণ নাই; এমন রূপ কেবল লতাকিসলয়ে সাজাইতেছেন। কিন্তু দৈবযোগে তাঁহারা কিছু আভরণ পাইলেন। বনস্পতিরা কুসুমের পরিবর্ত্তে কেহ ক্ষৌমবসন, কেহ লাক্ষারস, কেহবা বহু মূল্য আভরণ প্রদান করিল। তখন সখীরা আর এক বিষম সমস্যায় পড়িলেন। কেমন করিয়া অলঙ্কার পরাইতে হয়, কেহই জানেন না। তখন উভয়ে অধীতবিদ্যার আশ্রয় নিলেন। তাঁহারা চিত্রে নানা রকম অলঙ্কার দেখিয়াছেন। যেমন যেমনটী অলঙ্কার চিত্রে যেখানে যেখানে দেখিয়াছিলেন, সেই রকম পরাইলেন। আজ কাল যাঁহারা ছবিতে মেমের পোষাক দেখিয়া গাউনের ফরমাস করেন, তাঁহাদের দেখিতেছি, নজীর আছে। তবে এক্ষণে কারিগরীর বাহাদুরীটা দর্জীর, যাঁহারা গাউন পরেন, তাঁহাদের বড় একটা নয়।

শকুন্তলা আশ্রমের বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী সকলেরই কাছে বিদায় লইলেন। এই কণ্বের আশ্রম এক কবিতাময়, মায়াময়, প্রহেলিকাময় দেবভূমি। এখানকার প্রত্যেক তরুলতা, মৃগ-শাবক পক্ষী মহর্ষির আশ্রমপরিবারভুক্ত। প্রত্যেকেই জীবনী-শক্তিবিশিষ্ট। মহামুনি তপোবন-তরুগুলিরও অনুজ্ঞা লইয়া কন্যাকে পতিগৃহে পাঠাইতেছেন।

> পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা।
> নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
> আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
> সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥

গর্ভবতী হরিণী, ক্ষুদ্র হরিণ শিশুটীও শকুন্তলার পরম আদরের পাত্র। মহাকবি এই অঙ্কে দেখাইয়াছেন, কেন কুন্তলা আশ্রম-

ললামভূতা এবং কেনই বা তিনি "কণ্বস্য কুলপতে রুচ্ছ্ৰ্সিতম্।" এখানে শকুন্তলাই প্রধানা। এখানে সখীদের বিশেষত্ব কিছুই নাই। মাঝে মাঝে মহাকবি দেখাইয়াছেন, শকুন্তলা সখীদের কত ভালবাসেন, আর সখীরাই বা তাঁহাকে কত ভালবাসে। লতাভগিনী বনজ্যোৎস্নাকে সখীদের হাতে সঁপিয়া দিলেন। তখন সখীরা বড় দুঃখের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমাদের কাহার কাছে দিয়া চলিলে"। কি মর্ম্মস্পর্শিণী ভালবাসার কথা। শকুন্তলার বড় ইচ্ছা সখীদের সঙ্গে নিয়া যান। কিন্তু মহর্ষি বলিলেন "বৎসে, ইমে অপি প্রদেয়ে, ন যুক্তমনয়োস্তত্র গন্তুম্"। এ দৃশ্যে দুটী সখী এক হইয়া গিয়াছেন। এখানে তাঁহাদের পরস্পরের ভিন্ন অস্তিত্ব নাই, এখানে তাঁহাদের চরিত্রগত পার্থক্য নাই। যা কিছু বলিতেছেন, প্রায় দুজনেই এক সঙ্গে বলিতেছন। কারণ সখীপ্রীতি উভয়ের তুল্য, তাহাতে একটুও উনিশ বিশ নাই। এমন কি, উভয়ে এক সঙ্গেই সখীকে আলিঙ্গন করিলেন। এমন যুগ্ম সখী কি পৃথিবীর আর কোন কাব্য-নাটকে আছে। এমন আশ্রম, এমন সখীদের, ছাড়িয়া পতিদর্শনা-কাঙ্ক্ষিণী শকুন্তলারও চরণ চলিতেছে না। সখীদের অবস্থাও তাই। এমন সখীকে ছাড়িতে ইচ্ছা করিতেছে না। প্রিয়ম্বদা শকুন্তলাকে বলিলেন, সখী, তুমিই কেবল তপোবন বিরহকাতরা, এরূপ নহে, তোমার উপস্থিত বিয়োগেও তাপোবনের সমান অবস্থা হইতেছে; দেখ মৃগগণ দর্ভগ্রাস ছাড়িয়াছে, ময়ূরেরা নৃত্য ত্যাগ করিয়াছে, আর লতিকারা পাণ্ডুপত্ররূপ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে"। এইরূপ গভীর বিরহ পৃথিবীকে আর একবার ব্যাকুল করিয়াছিল।

শীর্ণা গোকুলমণ্ডলী পশুকুলং শষ্পায় ন স্পন্দতে।
মূকাঃ কোকিলপংক্তয়ঃ শিখিকুলং ন ব্যাকুলং নৃত্যতি।
সর্ব্বে তে বিরহানলেন সন্ততং গোবিন্দ দৈন্যং গতাঃ
কিন্ত্বেকা যমুনা কুরঙ্গনয়না নেত্রাম্বুভির্বর্দ্ধতে।।

সখীদের অশ্রুতে পুণ্যতোয়া মালিনীরও জল বাড়িয়াছিল। কিন্তু মহাকবি সে দৃশ্য আর আমাদের দেখান নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সম্প্রদায়

হরিদাসী বৈষ্ণবীর গান শুনিয়া নগেন্দ্রের অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকেরা প্রথমে তাহার ভারি সুখ্যাতি করিয়াছিল। বৈষ্ণবী চলিয়া গেলে ক্রমে একটু একটু করিয়া তাহার দোষ বাহির হইতে লাগিল। প্রথমে আরম্ভ হইল, তাহার নাকটা একটু চাপা, রংটা বড় ফেঁকাসে। ক্রমে প্রকাশ পাইল তাহার চুলগুলা শণের দড়ি, কপালটা উঁচু, ঠোঁট দুখানা পুরু, গড়নটা কাট কাট ইত্যাদি। তারপর বৈষ্ণবীর গানের কথা উঠিল। প্রথমে হইল মাগীর গলা মোটা, তারপর মাগী যেন ষাঁড় ডাকে; শেষে হইল মাগী গান জানে না, মাগীর তালবোধ নাই। এইরূপে ক্রমশঃ প্রতিপন্ন হইল যে সেই রমণীকুলদুর্ল্লভ সৌন্দর্য্যশালিনী বৈষ্ণবী কেবল যৎপরোনাস্তি কুৎসিতা তাহা নহে—তাহার অপ্সরো-নিন্দিত কণ্ঠনিঃসৃত তানলয়স্বরশুদ্ধ গানও যারপর নাই অপকৃষ্ট।

বাঙ্গালার সাধারণ স্ত্রীচরিত্র এইরূপ। বুঝি বা বাঙ্গালার পুরুষ-চরিত্র ইহা অপেক্ষা অধিক উন্নত নয়। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে সকল ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ জন্মপরিগ্রহ দ্বারা এই অধম

দেশকে পবিত্র করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রথমে মহামহিমান্বিত প্রতিভাশালী বলিয়া দিনকতক সাধারণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং খুব প্রশংসাভাজনও হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহাদের খুঁত বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে; এবং কেহ কেহ প্রমাণ করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র যে ইহাঁরা অতি নগণ্য সামান্য লোক ছিলেন। বাঙ্গালী এইরূপেই স্বদেশীয় মহাপুরুষদিগের সম্মান করে। কেনই না লোকে বলিবে, বাঙ্গালী অতিশয় পরশ্রীকাতর; একজন স্বজাতীয়, প্রতিভা বলে সমুন্নত আসনে সমাসীন হইলে, কিসে তাহার পতন হইবে, বাঙ্গালী কায়মনোবাক্যে কেবল তাহারই চেষ্টা করে। সুখের বিষয় এই যে যাঁহারা প্রকৃত মহাপুরুষ তাঁহারা স্বকীয় প্রতিভাজ্যোতিঃ প্রভাবে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মেঘনির্ম্মুক্ত মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন। Mob (ইতর)এর নিন্দা তাঁহাদের যশোমন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না।

এই সকল মহাপুরুষদিগের মধ্যে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন শ্রেষ্ঠ মহাসৌভাগ্যশালী ব্যক্তি। ইনি বাঙ্গালার সাহিত্যজগতে অতুল; সৃষ্টিকারিণী প্রতিভার প্রভাবে বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল অমূল্য কাব্যরত্ন রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতেই ইঁহাকে কালিদাস, অথবা সেক্সপিয়ারের ন্যায় অমর করিয়া রাখিবে। কিন্তু ইনিও নিন্দুকের নিন্দা অথবা মূর্খের ধৃষ্টতা হইতে নিরাপদ হইতে পারেন নাই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মহাকবিদের অবস্থাও বোধ হয় এইরূপ। Shakespear সম্বন্ধে Green এইরূপ বলিয়াছিলেন, "An upstart crow, beautified with our feathers, that with his tiger's heart wrapt in a player's hide, supposes he is as well

able to bombast out a blank verse as the best of you." অন্যের কথা দূরে থাকুক কোন কোন ধর্ম্মমতানুসারে স্বয়ং ভগবানের সয়তাননামা নিন্দুক আছে। শ্রীকৃষ্ণের শিশুপাল ছিল। মহাপুরুষদের অদৃষ্ট এইরূপই হইয়া থাকে।

বঙ্কিম বাবুর মৃত্যুর পর মাঝে মাঝে তাঁহার কাব্যগ্রন্থাদি সম্বন্ধে তাঁহার উপর কিছু তীব্র আক্রমণ হইতেছে। ইহার দ্বারা বঙ্কিম বাবুর প্রতিভা অথবা যশের কিরূপ লাঘব হইয়াছে, তাহা তাঁহার মৃত আত্মার দ্রষ্টব্য। আমরা জানি ভস্মের দ্বারা পরি-মার্জ্জিত হইলে নির্ম্মল কাচের স্বাভাবিক স্বচ্ছতা যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এই সকল সমালোচনা দ্বারা তাঁহার প্রতিভাজ্যোতিঃ সেইরূপ আরো দীপ্ততর হইয়াছে। দু একটা উদাহরণ দিতেছি।

সম্প্রতি "সাহিত্য ও সমাজ" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক এই পুস্তিকায় বিষবৃক্ষের সমা-লোচনা করিয়াছেন। এই সমালোচনেরও অনেক ক্ষুদ্র সমা-লোচনা বাহির হইয়াছে। একজন সমালোচক লিখিয়াছেন "এই পুস্তক পড়িয়া বঙ্কিম বাবুর দ্বারা আমাদের সমাজের যে ভীষণ অনিষ্ট হইতেছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়"। রহস্যপ্রিয় সমালোচক পরিহাস করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না কিন্তু গ্রন্থকার গম্ভীরভাবে সবিশেষ পরিশ্রম করিয়া বঙ্কিম বাবুকে সমাজের ঘোরতর অনিষ্টকারী বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবিকই বঙ্কিম বাবু বড় অন্যায় করিয়া গিয়া-ছেন। তিনি গ্রন্থ মধ্যে বৈষ্ণবী, ব্রাণ্ডী, হট্ওয়াটার প্লেট্, ডেকাণ্টার, রোষ্ট্মটন্, কট্লেট্, বিধবাবিবাহ, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি কতকগুলি বদ্‌রকমের, কুরুচিপূর্ণ পদার্থের সমাবেশ

করিয়া গিয়াছেন!!! গ্রন্থখানি আজও পর্য্যন্ত যে সুরুচির কোপানলে ভস্মীভূত হয় নাই ইহাই আশ্চর্য্য। একজন দুষ্টা স্ত্রীলোককে সমগ্র মহাভারত শোনাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল "তোমার মহাভারতের কোন কথাটা মনে আছে?" তাহাতে রমণী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিল, "দ্রৌপদীর পাঁচটি স্বামী এবং তাঁহার পূজনীয় শ্বশ্রূঠাকুরাণীর তার উপর আর একটি"। যদি কেহ এই বুদ্ধিমতী রমণীর ন্যায় গ্রন্থের এইরূপ অপরূপ সার-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েন তাহা হইলে তাঁহার নিকট "বিষবৃক্ষ"ও যে বিষবৎ বোধ হইবে সন্দেহ কি। বঙ্কিম বাবু গ্রন্থশেষে বলিয়াছেন, "আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম, ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে"। আমরাও জানি এই পুস্তকের বহুল প্রচারে গৃহে গৃহে অমৃতই ফলিয়া থাকে এবং আমাদের এই বিশ্বাস ক্রমশই দৃঢ়ীভূত হইতেছে। তবে পূর্ব্বকথিতা মহাভারত-শ্রোত্রীর ন্যায় পাঠকের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা। বিষবৃক্ষের ন্যায় একখানা কাব্য আমরা যতবারই পাঠ করি ততবারই ইহাতে নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই এবং প্রতিবারই মনে করি আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত জীব হইলাম এবং আমাদের চরিত্রের ভিত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর হইল। কাব্য এবং ধর্ম্মোপদেশ যে তুল্য ফলদায়ি তাহা "বিষবৃক্ষ" পড়িয়া বুঝা যায়।

বিগত বৎসরের বৈশাখের "ভারতী"তে একজন লেখক বঙ্কিম বাবুকে কিছু বিশেষ তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। ইনি "মীরকাসিম" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন বঙ্কিম বাবু ঘোরতর মুসলমানবিদ্বেষী ছিলেন; তিনি ইচ্ছা করিয়া জানিয়া শুনিয়া, মীরকাসিম, মহম্মদ তকি খাঁ প্রভৃতির উন্নত ঐতিহাসিক চরিত্র বিকৃত করিয়া উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বহুমূল্য

প্রবন্ধ যিনিই পাঠ করিয়াছেন তিনিই ইহার মূল্য বুঝিয়াছেন। এই লেখকের বোধ হয় মনে মনে ইচ্ছা বঙ্কিম বাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী কবির নিন্দা করিতে পারিলে নিজে একজন শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবেন। সেই জন্যই কিছু অতিরিক্ত তীব্রভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। কাব্য, ইতিহাস, উপন্যাস প্রভৃতি কাহাকে বলে, তদ্বিষয়ে লেখকের কতদূর জ্ঞান তাহা তাঁহার দুচারিটা কথা হইতেই বেশ বুঝায়। ইনি বলেন, বঙ্কিমের যে সকল ঐতিহাসিক উপন্যাস এখন সমাদর লাভ করিতেছে, তাহা চিরকাল সমাদর লাভ করিবে না, কারণ তাহা অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। "চন্দ্রশেখর" উপন্যাস ইঁহার কাছে "ষোল বৎসরের নায়ক—আট বৎসরের নায়িকা প্রতাপ ও শৈবলিনীর শৈশব প্রণয়োন্মেষের উপন্যাস"। ইঁহার সহিত তর্ক করা বৃথা! বোধ হয় বঙ্কিম বাবুর "ছেলেভুলান উপকথা" বাঙ্গালা দেশে আর স্থান পায় না!! বঙ্কিম বাবুর প্রতিভার ইনি বেশ বর্ণনা করিয়াছেন, "—তিনি ইতিহাস লিখিলে যে কি লিখিতেন, বুঝিতেই পারা যায়। অবসর হয় নাই বলিয়া ইতিহাস লেখা ঘটে নাই, অবসর হইয়াছিল বলিয়া উপন্যাস লেখা ঘটিয়াছিল; সুতরাং "নেড়ে বেটাদের" শ্রাদ্ধটা তাহাতেই সুসম্পন্ন করা হইয়াছে"। এই লেখক ঝুলির ভিতর হইতে বিড়াল বাহির করিয়াছেন। ইনি এক জায়গায় বলিয়াছেন "তাঁহার (বঙ্কিম বাবুর) লেখনী, মুক্তক্ষরীণ, হইতে কোথাও কোথাও ঐতিহাসিক তত্ত্বসংগ্রহের বিজ্ঞাপন দিয়া, উপন্যাস রচনা করায়, অনেকে তাঁহার উপন্যাসকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন"। এখানে "অনেকে" মানে, অবশ্য লেখক স্বয়ং। লেখক মহাশয় অনন্যদৃষ্টবুদ্ধি বলে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসকে

ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিয়া নিজের প্রবন্ধের আগাগোড়া ভুল করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু যে প্রকৃতপক্ষে মীরকাসিমকে মহানুভবচরিত্র করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন তাহা এই লেখক আদৌ ধারণা করিতে পারেন নাই। উপন্যাসের তকি খাঁ যে ঐতিহাসিক তকি খাঁ নহে তাহাও বুঝিতে সক্ষম হয়েন নাই। সেক্সপিয়ারের ন্যায় মহাকবিও যে তৃতীয় রিচার্ড, রাজা জন, পঞ্চম হেন্‌রী প্রভৃতির চরিত্রে তাঁহাদের ঐতিহাসিকতা রক্ষা করেন নাই তাহা ইনি অবগত নহেন। তাই তিনি প্রবন্ধ শেষে কুলকিনারা না পাইয়া ফরাসি ভাষার সাহায্য লইয়াছেন, বলিয়াছেন "ফরাসি সম্রাট্ মহাবীর নেপোলিয়ন দেশবহিষ্কৃত ও চিরনির্ব্বাসিত হইলেও তাঁহার স্বদেশের সাহিত্যসেবকগণ তাঁহার ঐতিহাসিকচরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন"। একশ্রেণীর মনুষ্যের চক্ষু সর্ব্বদাই পৃথিবীর প্রান্তভাগে বিচরণ করে। লেখক শুদ্ধ বঙ্কিমকে গালি দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি দেশশুদ্ধ লোককেই গালি দিয়াছেন; বলিয়াছেন, "ঐতিহাসিক বিষয়ে এদেশের লোক অজ্ঞ উদাসীন, উৎসাহ শূন্য"। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই বোধ হয় "ভারতী"র মহিলা সম্পাদকেরা এই লেখককে "অকাট্য প্রমাণাস্ত্রধারী" বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে হরিদাসী বৈষ্ণবীর সমালোচিকারাও "অকাট্য প্রমাণাস্ত্রধারিণী" এবং সত্যের আবিষ্কর্ত্রী।

সম্প্রতি বিগত বৈশাখের "নব্যভারতে" একজন লেখক আভাষ দিয়াছেন তিনি বারান্তরে বঙ্কিম বাবুর দোষ দেখাইবেন। তিনি শ্রীযুক্ত গিরিজা প্রসন্ন রায় চেধুরী প্রণীত "বঙ্কিমচন্দ্র" নামক গ্রন্থ সম্বন্ধে দুচারিটি কথা বলিয়া পরে বলিয়াছেন; "—বঙ্কিম বাবুর অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্য আবিষ্কার করিতে একা গিরিজা

বাবু সমর্থ হইবেন সম্ভাবনা নাই। কেবল কি শিল্প নৈপুণ্য? বঙ্কিম বাবুর লেখনীর প্রভাব সমাজের উপর, সাহিত্যের উপর কিরূপ? তিনি যে মানবচরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা স্বাভাবিক অদৃষ্ট বা অলৌকিক?...এইরূপ সহস্র বিষয়ের অনুসন্ধিৎসা একা গিরিজা বাবু পরিতৃপ্ত করিতে পারিবেন, বা একা কেহ পারিবেন, ইহা সম্ভব নহে। গিরিজা বাবুর মত শত রথি এ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে আকাঙ্ক্ষা কদাচিৎ পূর্ণ হইত"। মহীয়সী প্রতিভার সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে যাহা কিছু প্রকৃত দোষ তাহা দেখাইতে পারিলে ক্ষতি নাই। গুণসন্নিপাতে ক্ষুদ্র দোষ জ্যোতিরাশি মধ্যে চন্দ্রাঙ্কের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়।

এই রূপে দেখা যাইতেছে বঙ্কিমচন্দ্রের দোষকীর্ত্তন পূর্ব্বে বহুবিধরূপে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতের জন্যও তদ্বিষয়ে চেষ্টা চলিতেছে। ইহাতে বঙ্কিম প্রতিভার বড় একটা কিছু যায় আসে না এবং তাঁহার যশেরও কিছু লাঘব হয় না। যাহা খাঁটি সোণা তাহার উজ্জ্বলতা চিরকাল থাকিবে। সকলের সকল কথার আন্দোলন করা চলে না। সকলের সকল কথার প্রতিবাদ করিবার কাহারও অবসর হয় না; আর সকল কথা সবিস্তারে বলিয়া পাঠকের সময় বৃথা নষ্ট করাও ঠিক নয়। বঙ্কিম বাবুরনামে যে সকল চার্জ করা হইয়াছে তার মধ্যে একটা কথাই গুরুতর। মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায় বঙ্কিম বাবু বড় মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন। পূর্ব্বকথিত "ভারতীর" লেখক কেবল এই কথা বলিয়াছেন তাহা নয়, ইহার পূর্ব্বেও মাসিক সাহিত্যে দু চারিবার এইরূপ অভিযোগ হইয়াছে। কথাটা যখন সম্পূর্ণ মিথ্যা হইয়াও ক্রমাগত উঠিতেছে, এবং ইহাতে যখন কোন কোন লোকের

চিত্ত কলুষিত হইতে পারে সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া একথার একটা মীমাংসা করা উচিত। আজকাল যেরূপ সময় পড়িয়াছে তাহাতে এই অভিযোগের পুনরুত্থাপন বাঞ্ছনীয় নহে। বিশেষতঃ ইহা অলীক। ব্রিটীস শাসনে এখন হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। বঙ্কিম বাবু যে শিক্ষা শিখাইয়া গিয়াছেন অনেক শিক্ষিত হিন্দু সেই শিক্ষাই শিখিতেছেন; আর বোধ হয় ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের অধিকাংশ লোকই বঙ্কিমের ভক্ত ও শিষ্য হইবেন। এরূপ অবস্থায় যদি স্বার্থসাধনতৎপর লেখকেরা বঙ্কিমচন্দ্রকে মুসলমানবিদ্বেষী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে আমাদের দেশের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের অনেক লোকই হয় ত কুসমালোচনার কুহকে পড়িয়া অলক্ষিতভাবে মুসলমানবিদ্বেষ শিক্ষা করিবেন। তাহা হইলে হিন্দুমুসলমানের পরস্পরের সম্প্রীতির আর আশা থাকিবে না। উভয়েরই উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইবে, আমরা আরো দুই এক শতাব্দী পশ্চাতে পড়িয়া থাকিব। এই জন্য অন্যান্য কথার আলোচনার প্রয়োজন না হইলেও এই মুসলমানবিদ্বেষ কথাটার প্রতিবাদ বিশেষ আবশ্যকীয় হইয়াছে। আমরা কেবল ইহাই দেখাইব যে বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যাদি গ্রন্থ পড়িয়া অতি সহজে বুঝা যায় তাঁহার মুসলমান জাতির প্রতি ঘুণাক্ষরেও বিদ্বেষভাব ছিল না বরং বিশেষ প্রীতিভাব ছিল। জীবিতকালে তাঁহার কার্য্যকলাপে তিনি যে আদৌ মুসলমানদ্বেষী ছিলেন না একথার প্রমাণ করিবার জন্য বোধ হয় অনেক লোক জীবিত আছেন। এই জন্যই আমরা কেবল আভ্যন্তরীণ প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিব। তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী মহাকবির কোন জাতিবিশেষের প্রতি বিদ্বেষভাব থাকিতে পারে না।

কালিদাস অথবা সেক্সপিয়ারের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সৃষ্টিকারিণী। মানব চরিত্রচিত্রণ ক্ষমতাই ইঁহাদের প্রধান গুণ। মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির বর্ণনাই তাঁহাদের কাব্যের মুখ্য বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র স্বকীয় কাব্য জগতে অসংখ্য নরনারীর সৃষ্টি করিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমান লইয়া আমাদের দেশ বলিয়া তাঁহার কাব্যবর্ণিত ব্যক্তিগণের অধিকাংশই হিন্দু আর মুসলমান। প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান চরিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সমস্ত উপন্যাসগুলি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া প্রত্যেক মুসলমান চরিত্রের সবিস্তার সমালোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। এই জন্য আমরা কেবল যে কয়েক খানি উপন্যাসে মুসলমানচরিত্র কিছু সবিস্তারে চিত্রিত হইয়াছে সেই গুলিতেই আমাদের অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ করিব।

বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বপ্রথম উদ্যমের লেখা "দুর্গেশনন্দিনী"; ইহা তাঁহার কাব্যরত্নমালার মধ্যে একখানি শ্রেষ্ঠ রত্নও বটে। এই উপন্যাসের দুইটি প্রধান পাত্র মুসলমানজাতীয়। একটি ওস্‌মান্, অপরটি আয়েষা—একটি পুরুষ অপরটি স্ত্রী। গ্রন্থকার স্বয়ং, ওস্‌মান্‌কে "পাঠান কুলতিলক" এবং আয়েষাকে "রমণীরত্ন" বলিয়াছেন। বাস্তবিক এইরূপ দুটি উজ্জ্বলচিত্র সাহিত্যভাণ্ডারে বড় বিরল। ওসমান্ বন্দীকৃত পীড়িত রাজপুত্রের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার দেখাইয়াছেন তাহা জগতে দুর্ল্লভ। ওস্‌মান্ পরোপকার মহা ব্রতে প্রণোদিত হইয়া আয়েষার ন্যায় জগৎসিংহের সেবাশুশ্রূষা করিতেনে। তাঁহার এই মহানুভবতা কবি কেমন পরিস্ফুট করিয়াছেন; "কাহারও কাহারও অভ্যাস আছে যে পাছে লোকে দয়ালুচিত্ত বলে, এই লজ্জার আশঙ্কায় কাঠিন্য-প্রকাশ করেন; এবং দয়াশীলতা নারীস্বভাবসিদ্ধ বলিয়া উপহাস

করিতে করিতে পরোপকার করেন। লোকে জিজ্ঞাসিলে বলেন, ইহাতে আমার বড় প্রয়োজন আছে। আয়েষা বিলক্ষণ জানিতেন ওস্‌মান্‌ তাহারই একজন"। কবি এই মহৎ গুণ পাঠান ওস্‌মানে অর্পণ করিয়া নিজের মহানুভবতা এবং জাতিবিদ্বেষহীনতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। বিমলার প্রতি ওস্‌মানের ব্যবহার ও তাঁহার মহানুভবতা ও উদারতার দ্বিতীয় উদাহরণ। আর ওসমানের অন্যান্য গুণও অপরিমেয়। তিনি জগৎসিংহের সমতুল্য বীর। কিরূপ অপূর্ব্ব কৌশল ও অসমসাহসিকতার সহিত তিনি গড়মান্দারণ দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতেও আমরা তাঁহার বীরত্বের লাঘব দেখি না। তিনি নিজ প্রাণপ্রার্থী হন নাই। আর এক কথা এই যে জগৎসিংহ আখ্যায়িকার নায়ক। তৃতীয় কথা এই বলা যাইতে পারে যে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতিকেও দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত করিতে পারে এমন সহস্রাধিক যোদ্ধা আছেন। গুণরাশির সমবায়ে তিনি জগৎসিংহ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন।

তারপর আয়েষার কথা। কবি নিজে বলিয়াছেন "যেমন উদ্যান মধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনিই আয়েষা"। আমাদের মনে হয় কবি যতগুলি রমণীরত্ন সৃষ্টি করিয়াছেন, সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যেন এই আয়েষা। আখ্যায়িকার নাম "দুর্গেশনন্দিনী" বটে কিন্তু আয়েষাই গ্রন্থের প্রকৃত নায়িকা। এই আখায়িকায় আয়েষা আছে বলিয়াই "দুর্গেশনন্দিনী" শ্রেষ্ঠ উপন্যাস; নতুবা বাজারের বাজে উপন্যাসের সমান হইত। রমণীর যত রকম গুণ হইতে পারে সমস্তই আয়েষার আছে। আয়েষা "চমৎকারকারিণী পরহিতমূর্ত্তিমতী"। তিনি পীড়িত জগৎসিংহের সেবা করিয়া তাঁহার প্রাণ দান করিলেন। ওসমান্‌

যথার্থই বলিয়াছিল, "তোমার গুণের সীমা দিতে পারি না ; তুমি এই পরম শত্রুকে যে যত্ন করিয়া শুশ্রূষা করিতেছ, ভগিনী ভ্রাতার জন্য এমন করে না"। আয়েষার বিরাম নাই, শ্রান্তিবোধ নাই, অবহেলা নাই। রাত্রিদিন রোগীর শুশ্রূষা করিতেছেন। প্রতি-দিন যতক্ষণ স্নানাদি কার্য্যের সময় অতীত না হইয়া যায় ততক্ষণ আয়েষা জগৎসিংহের কক্ষ ত্যাগ করিতেন না। আবার ক্ষণকাল পরেই ফিরিয়া আসিতেন। যতক্ষণ না তাঁহার জননী বেগম কিঙ্করী পাঠাইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতেন, ততক্ষণ জগৎসিংহের সেবায় ক্ষান্ত হইতেন না। তারপর যখন তিলোত্তমা জগৎসিংহের কক্ষে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন তখন আয়েষা আসিয়া কি করিলেন? অপরিচিতা বলিয়া তিলোত্তমার পরিচয় লইয়া আয়েষা একেবারে তাঁহাকে কোলে করিয়া বসিলেন। কবি বলিতেছেন, "আর কেহ কোনরূপ সঙ্কোচ করিতে পারিত ; সাতপাঁচ ভাবিত ; আয়েষা একেবারে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন"। ভুবনমোহিনীর কোলে ভুবনমোহিনী প্রতিমা বড়ই অপূর্ব্ব মধুরদৃশ্য ! আয়েষার জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তি সম্যক্ অনুশীলিত। আয়েষা শুধু জ্ঞানময়ী নহেন, আয়েষা প্রেমময়ী, আনন্দময়ী ; আয়েষা কর্ম্মবীর। ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম্মে আয়েষার স্বতঃপ্রবৃত্তি। আয়েষা জগৎসিংহকে কারামুক্ত করিতে প্রস্তুত। তারপর যখন দৃপ্তাসিংহীর ন্যায় জগৎসিংহের সমক্ষে ওস্‌মানের কাছে নিজের প্রাণের কথা খুলিয়া বলিলেন, তখন আমরা জ্ঞান ও প্রেমের এক অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিতে পাই ; জ্ঞানবৃত্তি ও প্রেমবৃত্তি পরস্পরকে দমন করিতেছে, পরস্পরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে। আয়েষা ওস্‌মানকে ক্লেশ দিতে অনিচ্ছুক। আয়েষা বলিতেছেন, "আয়েষা অন্য যে অপরাধ করুক, আয়েষা অবিশ্বাসিনী নহে। আয়েষা যে কর্ম্ম করে তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে

পারে"। পুনরায় আয়েষা ওস্‌মান্‌কে বলিলেন, "আমি তোমার পূর্ব্বমত স্নেহপরায়ণা ভগিনী; ভগিনী বলিয়া তুমিও পূর্ব্বস্নেহের লাঘব করিও না। কপালের দোষে সন্তাপসাগরে ঝাঁপ দিয়াছি, ভ্রাতৃস্নেহে নিরাশ করিয়া আমায় অতল জলে ডুবাইও না"। কবি আর এক জায়গায় বলিয়াছেন, "আয়েষা যাহা করিতেন, তাহাই সুন্দর দেখাইত; সকল কার্য্য সুন্দর করিয়া করিতে পারিতেন"। তাহার কারণ আয়েষার সমস্ত চিত্তবৃত্তিগুলিই অনুশীলিত। আয়েষার ভালবাসা জগতে অতুল। ইহাই প্রকৃত নিষ্কাম ভালবাসা। সাধ্বী বিবাহিতা রমণীর পতিদেবতার প্রতি ভালবাসাও এত মধুর এত উচ্চ আদর্শের নহে। আয়েষার বিদায়পত্রও তাঁহার প্রখর বুদ্ধিশালিতা, অপূর্ব্বচিত্তদমন ও সর্ব্বভূতপ্রীতির পরিচায়ক। ওস্‌মান্‌ পাছে ক্লেশ পায় সেই জন্য প্রাণের দেবতা জগৎসিংহেরও সহিত আয়েষা সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন না। আয়েষা লিখিতেছেন, "নিজের ক্লেশ—সে সকল সুখদুঃখ জগদীশ্বর চরণে সমর্পণ করিয়াছি"। হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়া, প্রাণের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া আয়েষা সন্তাপিত হৃদয়ে দিন যাপন করেন নাই। তিনি জগৎসিংহের বিবাহ উৎসবে আসিয়া "নিজ সহর্ষচিত্তের প্রফুল্লতায় সকলকেই প্রফুল্ল করিতে লাগিলেন। প্রস্ফুট শারদ সরসীরুহের মন্দান্দোলন স্বরূপ সেই মৃদুমধুর হাসিতে সর্ব্বত্র শ্রীসম্পাদন করিতে লাগিলেন"। সত্যই আয়েষা আনন্দময়ী। তারপর তিলোত্তমাকে বহুমূল্য রত্নালঙ্কার উপহার দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বহুমূল্য উপদেশ দিলেন। তারপর পাছে জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হয়, পাছে নারীজন্মে কলঙ্ক আসে সেই জন্য নিজের গরলাধার অঙ্গুরীয় দুর্গপরিখার জলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। আয়েষার এতগুণ আছে বলিয়াই জগৎসিংহ পীড়িত অবস্থায় তাঁহাকে দেবকন্যা মনে করিয়াছিলেন। এই

জন্যই কবির অন্যান্য শ্রেষ্ঠ নারীচরিত্র হইতে আয়েষার যেন একটু উৎকর্ষ আছে বলিয়া বোধ হয়। প্রফুল্লকুমারী কবিচিত্রিত একটি অত্যুজ্জ্বল রমণীরত্ন। কবি অনুশীলনতত্ত্বের উদাহরণস্বরূপ প্রফুল্ল-কুমারীকে আঁকিয়াছেন। আমরা প্রফুল্লের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির অনুশীলনই অধিক পরিস্ফুটরূপে দেখিতে পাই। প্রফুল্ল গৃহিণী হইবার পর তাহার পূর্ব্বানুষ্ঠিত অনুশীলনের কি ফল হইল তাহা বড় একটা স্পষ্ট দেখিতে পাই না। প্রফুল্লের গৃহিণীপনা কবি বড় সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই জন্য প্রফুল্লকে আদর্শ ধরা একটু কঠিন কাজ। কিন্তু এই আয়েষাতে আমরা অনুশীলনের উৎকৃষ্ট ফল দেখিতে পাই। আয়েষার নিষ্কাম কর্ম্ম, নিষ্কাম ধর্ম্ম-পালন আমরা অধিক স্ফুটরূপে দেখিতে পাই। গৃহে বসিয়া আয়েষার নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান বড়ই মধুর ও উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। অবশ্যই শৈশবে আয়েষার প্রফুল্লের ন্যায় শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির অনুশীলন হইয়াছিল। কিন্তু কবি সে চিত্র আমাদিগকে দেখান নাই। আমরা আয়েষাতে অনুশীলন দেখিতে পাই না, কিন্তু অনুশীলনের ফল দেখিতে পাই। এই জন্য আয়েষাকে প্রফুল্ল অপেক্ষা সহজ অনুকরণীয়া আদর্শরমণী বলিয়া বোধ হয়। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের আধার, এমন উজ্জ্বল মুসলমানরমণী-চরিত্র যিনি আঁকিয়াছেন, তিনি মুসলমানবিদ্বেষী ছিলেন একথা মনে করিলেও মহাপাতক হয়।

কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, আনন্দমঠ প্রভৃতি কয়েকখানি উপন্যাসেও মুসলমানজাতির কিয়ৎপরিমাণে কথা আছে এবং মুসল-মান চরিত্রের দু চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র আছে। কিন্তু কুত্রাপি কবি ঘুণাক্ষরেও তাঁহার জাতিবিদ্বেষের পরিচয় দেন নাই। কপাল-কুণ্ডলার নুরজাহান এবং মৃণালিনীর মহম্মদ আলি সুন্দর ও

অনিন্দনীয় চিত্র। আনন্দমঠে সন্তানসম্প্রদায়ের দু একটি সন্তানের মুখে মীরজাফর ও তাঁহার অধীনস্থ মুসলমানকর্ম্মচারিগণের অত্যাচারের কথা আছে এবং নিন্দাবাদও আছে। কিন্তু ইহা সমগ্র মুসলমানজাতির প্রতি বিদ্বেষের পরিচায়ক নহে। কি হিন্দু কি মুসলমান সকল জাতির মধ্যেই ভালমন্দ উভয় প্রকারের লোক আছে। মন্দলোকেরা নিন্দার্হ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর এ বিষয়ে ঐতিহাসিক সত্য কবির দিকে। তিনি বাঙ্গালা দেশের যে সময়ের চিত্র আমাদের নিকট ধরিয়াছেন তাহা ইতিহাসানুসারে সত্য। আরো একটা কথা এই, কবি নিজ উপন্যাসোক্ত পাত্রগণের উক্তির জন্য নিজে দায়ী নহেন। ভগবান্ হিন্দু মুসলমান দুইই সৃষ্টি করিয়াছেন। এ কথা অভ্রান্ত সত্য যে কোন কোন হিন্দু মুসলমানজাতির প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন এবং কোন কোন মুসলমানও হিন্দুবিদ্বেষী। কিন্তু সেই জন্য বলা যায় না যে সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ মুসলমানজাতির প্রতি অথবা হিন্দুজাতির প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। প্রতিভাশালী, কল্পনাজগতের স্রষ্টা, কবি সম্বন্ধেও একথা খাটে। যাহা ভগবানের জগতে সম্ভব, কবি তাঁহার কাব্যজগতে তাহাই চিত্রিত করিয়াছেন। কবি যে আদৌ মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন নহেন তাহা আনন্দমঠের শেষে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি সন্তান সম্প্রদায়ের কার্য্যের আদৌ অনুমোদন করেন না। তিনি চিকিৎসকের মুখ দিয়া বলাইলেন, "সত্যানন্দ কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না"। ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় সন্তানসম্প্রদায়ের কোন কোন লোকের যে সমসাময়িক মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষভাব ছিল,

গ্রন্থকার তাহারও অনুমোদন করেন না। আর এই গ্রন্থের মহা উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় কবি এই হিন্দু মুসলমানের ঐতিহাসিক বিবাদ চিত্রিত করিতে বাধ্য ছিলেন। ব্রিটীস্‌রাজ আমাদিগকে এই বিবাদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, অরাজকতা দূর করিয়াছেন; ভগবানের ইচ্ছায় বহির্বিষয়ক জ্ঞান শিখাইবার জন্য ইংরাজ এদেশে আসিয়াছেন। এই সকল কথা বুঝাইবার জন্য কবি যাহা যাহা চিত্রিত করিয়াছেন তাহার কিছুই অসংলগ্ন অথবা অন্যায্য নহে।

"চন্দ্রশেখরে" আর তুটি মুসলমান চরিত্রের চিত্র দেখিতে পাই। একটি মীরকাশিম অপরটি তাঁহার বেগম দলনী। ইহারা তুজনে ওস্‌মান ও আয়েষার অনুরূপ। মীরকাসিম, ঐতিহাসিক চরিত্র—বাঙ্গালার নবাব। কবি তাঁহার মীরকাসিমকে, ঐতিহাসিক মীরকাসিমের ন্যায় বীরপুরুষ, স্বদেশরক্ষণে প্রাণপণে যত্নবান্, কার্য্যদক্ষ ও নীতিজ্ঞ করিয়াছেন। বেশীরভাগ তিনি তাঁহাকে কেবল নবাব করেন নাই, তাঁহাকে মনুষ্যত্বগুণের অধিকারী করিয়াছেন। তাঁহার পতিপরায়ণা সাধ্বী বেগম যেমন তাঁহার উপরে অচলভক্তিপরায়ণা, তিনিও বেগমের প্রতি তদ্রূপ অনুরক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে বড়ই উন্নতচরিত করিয়াছেন। মীরকাসিম দলনীকে বলিতেছেন "যদি প্রজার হিতার্থ রাজ্য করিতে না পারিলাম তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব, অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব? আমি সেরাজউদ্দৌলা বা মীরজাফর নহি।" তাই মীরকাসিম পরাজয় অবশ্যম্ভাবি জানিয়াও যুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। আমরা নবাবের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি যথেষ্ট অনুশীলিত দেখিতে পাই। নবাব দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ; তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রেরও চর্চ্চা করিয়া থাকেন; তিনি সাহসিনী শৈব-

লিনীর ন্যায় অপরিচিতা দুরবস্থাপন্ন হিন্দুরমণীকেও সাহায্য করিয়া থাকেন। তিনি গুরগণ খাঁর অন্তঃকরণের অন্তস্তল পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিতেন; প্রতাপরায় দস্যুবৃত্তি করাতেও তাহাকে খেলোয়াত দিতে প্রস্তুত। এ সকল নবাবোচিত গুণ। নবাবের মনুষ্যত্ব আমরা দলনীর মৃত্যুর পর দেখিতে পাই। কুল্‌সমের মুখে দলনীর বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি বালকের ন্যায় "দলনী" "দলনী" বলিয়া রোদন করিয়াছিলেন। তীব্রশোকাভিষঙ্গে অভিভূত হইয়া মীরকাসিম বলিয়াছিলেন, "তোমরা পার গড় রক্ষা কর। আমি রুহিদাসের গড়ে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লুকাইয়া থাকিব অথবা ফকিরি গ্রহণ করিব"। দলনীর শোক এতই তাঁহাকে লাগিয়াছিল। এই জন্যই প্রাচীন কবি বলিয়াছেন যাঁহারা মহাপুরুষ তাঁহাদের অন্তঃকরণ কখন বজ্রের অপেক্ষা কঠিন কখনও কুসুম অপেক্ষা কোমল; সকলে তাঁহাদের চরিত্র ধারণা করিতে পারে না"। এই মীরকাসিমও মহাপুরুষ। কবি দেখাইয়াছেন মীরকাসিম বীরপুরুষ নবাব হইলেও—অন্য লোকের ন্যায় মানবিকতাযুক্ত। তাই তিনি শেষে বলিয়াছেন "এ সংসারে নবাবী এইরূপ"। যদি কেহ এই শোকাভিভূত মীরকাসিমকে দেখিয়া তাঁহাকে স্ত্রৈণ বা কাপুরুষ মনে করেন তাহা হইলে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি বালকের বুদ্ধি অপেক্ষা অধিক উন্নত নয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর দলনীবিবি। ইনি যেন সীতা অথবা সাবিত্রীর ন্যায় পতিব্রতা। ইনি অপূর্ব্ব পতিভক্তি প্রণোদিত হইয়া পতির মঙ্গলকামনায় দুর্গের বাহিরে গিয়া আপনার অমঙ্গল ডাকিয়া আনিলেন। তারপর দলনী যতগুলি দুরবস্থায় পড়িয়াছেন সকল অবস্থাতেই অভূর্ব্ব পতিভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। মনে হয় আয়েষা বিবাহিতা হইলে বুঝি এইরূপ হইত। তবে দলনী আয়েষার মত প্রখর

বুদ্ধিশালিনী নহেন। দলনী পতিপ্রেমেই বিভোর। এমন অপূর্ব্ব চিত্র যিনি আঁকিয়াছেন তিনি মুসলমান বিদ্বেষী না ভেদজ্ঞানরহিত মহামনাঃ—মহাপুরুষ ?

"চন্দ্রশেখরে" তকি খাঁ নামক একজন জঘন্যচরিত্র মুসলমানের কথা আছে। তকি খাঁর মত লোক সকল জাতিতেই আছে। ঐতিহাসিক মীরকাসিমের অধীনেও একজন প্রকৃত তকি খাঁ রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার সহিত এই আখ্যায়িকার তকি খাঁর কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল নামের সাদৃশ্য মাত্র আছে। "চন্দ্রশেখরে"র তকি খাঁকে বঙ্কিমচন্দ্র "মুরশিদাবাদের নায়েব" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক তকি খাঁ হইতে তাঁহাকে বিভিন্ন রাখিবার জন্যই বোধ হয় এইরূপ করিয়াছেন, কারণ ইতিহাসের তকি খাঁ অন্যত্র ফৌজদার ছিলেন। ঐতিহাসিক তকি খাঁ কাটোয়ার যুদ্ধে মরিয়াছিলেন, আর এই কল্পনারাজ্যের তকি খাঁ কাটোয়া-যুদ্ধের পরও জীবিত ছিলেন। পাছে কেহ তাঁহার উপন্যাসকে ইতিহাস মনে করে এই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র স্থানান্তরে বলিয়াছেন, "দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর বা সীতারাম ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে"। আরো এরূপ কথা স্থানে স্থনে বলিয়াছেন, "উপন্যাস উপন্যাস, ইতিহাস নহে।" "সীতারামে"র এক স্থানে কবি বলিয়াছেন ; "ঐতিহাসিক কথা আমাদের কাছে ছোট কথা। আমরা তাহার বিস্তারিত বর্ণনায় কালক্ষেপ করিতে পারি না। উপন্যাস লেখক অন্তর্ব্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান্ হইবেন—ইতিবৃত্তের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা নিষ্প্রয়োজন"। ইংরাজি সাহিত্যেও আমরা দেখিতে পাই ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখকেরাও ইতিহাসোক্ত চরিত্রকে উপন্যাসে অন্যপ্রকার করিয়াছেন। লর্ড লিটন্ প্রভৃতি সুবিখ্যাত উপন্যাস লেখকেরা বলেন যে যেখানে ইতিহাস অস্ফুট, সেখানে

উপন্যাসলেখক অনায়াসে আপনার কল্পনার সাহায্যে নূতন ঘটনার সৃষ্টি করিতে পারেন। লর্ড লিটনের "Last of the Barons" তাহার এক দৃষ্টান্ত। যাহা প্রচলিত ইতিহাসে আছে তাহাই যে অভ্রান্ত সত্য একথা কেহ বলিতে পারে না। সাধারণের চক্ষে উপন্যাসকারের হাতে ইতিহাস বিকৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু হয়ত এমন ঘটিয়াছে যে উপন্যাসকার বিকৃত ইতিহাসকে প্রকৃত পথে আনিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের তকি খাঁ যখন কল্পনাসৃষ্ট তখন এ সকল কথাও বলিবার আবশ্যক নাই।

"সীতারাম" উপন্যাসেও হিন্দুমুসলমানের বিবাদের কথা আছে। হিন্দুকৃত মুসলমানের নিন্দা এবং মুসলমান কৃত হিন্দুর নিন্দা দুইই ইহাতে আছে। "আনন্দমঠ" সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে "সীতারাম" সম্বন্ধে ঠিক সেই কথাই প্রযোজ্য। কিন্তু সীতারামে, কবি একটি অপূর্ব্ব চিত্র চিত্রিত করিয়া নিজের নিরপেক্ষতা ও মহানুভবতা দেখাইয়াছেন। এই চিত্রটি চাঁদশা ফকিরের। চাঁদশাহ হিন্দুমুসলমানের অপূর্ব্ব সম্মিলন। যেমন এক দিকে জয়ন্তী, তেমনি আর এক দিকে চাঁদশাহ—উভয়ই নিষ্কাম ধর্ম্মের সুন্দর মূর্ত্তি। চাঁদসাহ সর্ব্বভূতে সমদর্শী। তিনি সীতারামকে শিখাইয়াছিলেন, হিন্দুর মন্দিরে, হিন্দুর হৃদয়ে যেমন ভগবান্ বিরাজ করেন, মুসলমানের মস্‌জিদে মুসলমানের হৃদয়েও তিনি তেমনি বিরাজ করেন। চাঁদশাহের কথায় সীতারাম নিজ নগরের নাম মহম্মদপুর রাখিয়াছিলেন; চাঁদসাহ সীতারামকে শিখাইয়াছিলেন, হিন্দুমুসলমানে সমান দৃষ্টি রাখিলে তবে তাঁহার রাজ্য টেঁকিবে। সীতারামও চাঁদসাহের পরামর্শে সীতারামের সকল বিষয় সুচারুমতে নির্ব্বাহ হইয়াছিল। চাঁদশাহ নিরীহ ও হিন্দুমুসলমানে সমদর্শী; এই জন্য তিনি সীতারামের হিতাকাঙ্ক্ষী

হইয়া অলক্ষিতভাবে গঙ্গারামের পশ্চাদনুগমন করিয়াছিলেন এবং ফৌজদারের সহিত তাঁহার সমস্ত কথোপকথন শুনিয়া আসিয়াছিলেন। তারপর যখন সীতারামের পাপের ভারে পৃথিবী পূর্ণ হইতে লাগিল, তখন সীতারামের রাজ্য ত্যাগ করিলেন। তাই বড়ই ক্ষোভে ফকির চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে বলিয়াছেন, "যে দেশে হিন্দু আছে সে দেশে আর থাকিব না; এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে"। যিনি সাম্যনীতির এই অপূর্ব্ব বিরাটমূর্ত্তি গড়িয়াছেন, মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষভাব তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

"রাজসিংহ" বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহাতেও কবি যথাসম্ভব ঐতিহাসিক চিত্রগুলি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। দরিয়াবিবি, মহাকবির কল্পনার একখানি উৎকৃষ্ট ছবি। মবারকও মুসলমানবীরের চিত্র। যেরূপ বীরত্বের সহিত মবারক সর্পদংশনদণ্ডাজ্ঞায় প্রাণত্যাগ করিলেন তাহা জগতে অতুলনীয়। এই ঐতিহাসিক উপন্যাসে রাজপুতের বাহুবল চিত্রিত করিতে গিয়া, কবি মুসলমানজাতির প্রতি যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান দেখাইয়াছেন। এ বিষয়ের গ্রন্থের উপসংহারে কবি নিজে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; "গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে কোন পাঠক না মনে করেন, যে হিন্দুমুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দ্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না; মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভালমন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপই আছে"। ইহাই কবির প্রকৃত প্রাণের কথা। যাঁহারা এইরূপ শতসহস্র প্রত্যক্ষ আভ্যন্তরীণ প্রমাণ না দেখিয়াই বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রকাশ্য লেখারদ্বারা মুসলমানদ্বেষী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাঁহাদের কবির একটি মহতী উক্তির মর্ম্ম জানিয়া রাখা উচিত; "যাহারা কু লেখা লিখিয়া

পরের চিত্ত কলুষিত করিতে চেষ্টা করে তাহারা তস্করদিগের ন্যায় মনুষ্যজাতির শত্রু। এবং তাহাদিগকে তস্করাদির ন্যায় শারীরিক দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত করা বিধেয়”। ধর্ম্মতত্ত্ব।

পরিশেষে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের মধুর নিরপেক্ষ ধর্ম্মমতের কথা বলিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি “অনুশীলন” নামক গ্রন্থে হিন্দুধর্ম্মের যে সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা হিন্দু মুসলমান খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি সকলেরই গ্রহণীয় হইতে পারে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম বড় উদার; অন্য ধর্ম্মদ্বেষী নহে। তাই গীতায় এই উদার উক্তি আছে; “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্”। অন্যান্য ধর্ম্মমতেরও প্রকৃত মর্ম্ম বোধ হয় এইরূপ। তবে সকল ধর্ম্মেই গোঁড়া আছে। এই অনুশীলনের একস্থলে আছে; “প্রহ্লাদ কথিত এই বৈষ্ণবধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। ইহা ধর্ম্মের সার, সুতরাং সকল ধর্ম্মেই আছে। খৃষ্টধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, এই বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্তর্গত। গড্ বলি, আল্লা বলি, ব্রহ্ম বলি, সেই এক জগন্নাথ বিষ্ণুকেই ডাকি”। ইহা অপেক্ষা আর নিরপেক্ষতা কি হইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু হইলেও মুসলমান, খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মের প্রতিও তাঁহার উচ্চদরের উদারভাব। এই “অনুশীলনের” অন্যত্র বঙ্কিম বলিয়াছেন “যে বৈজ্ঞানিক নাস্তিক, ধর্ম্মকে উপহাস করিয়া বিজ্ঞানই এই উন্নতির কারণ বলেন, তিনি জানেন না যে তাঁহার বিজ্ঞানও এই ধর্ম্মের এক অংশ, তিনিও একজন ধর্ম্মের আচার্য্য। তিনি যখন “Law” এর মহিমা কীর্ত্তন করেন, আর আমি যখন হরিনাম করি, দুই জন, একই কথা বলি। দুই জনে একই বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করি। মনুষ্য মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া এত বিবাদ-বিসম্বাদ না করিলেও চলে”। ইহা মহাকবিরই যোগ্য বটে।

এমন উদারচরিত মহাপুরুষের অন্যায় নিন্দাবাদে মন্দলোকের মন্দস্বভাবই কেবল প্রকাশ পায়। প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, "দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্"। আমরা প্রিয় পাঠক মহাশয়কে আরো একটু সাবধান করিয়া দিতেছি,

"ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে,
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্"।

দানতত্ত্ব।

দানধর্ম্ম সম্বন্ধে মহাভারতের একস্থলে এইরূপ উপদেশ আছে :—

"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরেধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নিরুজস্ত কিমৌষধৈঃ॥"

অর্থাৎ, দরিদ্রদিগকে দান করিবে, ধনবান্‌কে ধন দিবে না; যে ব্যক্তি রোগগ্রস্ত তাহারই ঔষধের আবশ্যক; নীরোগ ব্যক্তির কোন ঔষধের প্রয়োজন নাই। ইহাই দান সম্বন্ধে প্রকৃতবিধি। উপমাটি বড়ই সুন্দর। সর্ব্বসাধারণে এই বিধির অনুসরণ করিয়াই দানধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু মহাভারতে অন্যত্র শ্রীমৎ-ভগবদ্গীতায় এই কথাগুলি অতি সুন্দররূপে অথচ সংক্ষেপে বিশদরূপে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। সেই কথাগুলিই আমাদের আলোচ্য।

দান ঈশ্বরানুমোদিত মনুষ্যের একটি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। দানকর্ম্ম হৃদয়ের পবিত্রতাবিধায়ক, দানে চিত্তবৃত্তিগুলির বিকাশ সংসাধিত হয়। সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতায় ঠিক এই কথাই আছে—

"যজ্ঞদানংতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥"

এই দানকর্ম্ম আবার অনাসক্ত এবং ফলকামনাশূন্য হইয়া করিতে হইবে। "এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ। কর্ত্তব্যানি—"। কারণ অনুষ্ঠেয় কর্ম্মেতেই মানুষের অধিকার, কর্ম্মফলে কোন অধিকার নাই। অন্যান্য অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের ন্যায় দান ও নিষ্কাম হওয়া চাই। নতুবা তাহা আত্মোন্নতির অথবা ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ হইতে পারে না। গীতার যে স্থলে এই তত্ত্বকথা-গুলি বুঝান হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। এই কথা-গুলির একটু সবিস্তার সমালোচনায় দানের তত্ত্বকথাগুলি বুঝা যাইবেক।

"দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকংস্মৃতম্॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসংস্মৃতম্॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥"

ইহার মোটামুটি মানে এইরূপ। "'দান করা উচিত' এই বোধে, অনুপকারী ব্যক্তিকে যে দান করা যায় এবং দেশকালপাত্র বিবেচন করিয়া যে দান করা যায়, তাহা সাত্ত্বিক দান। প্রত্যু-পকারের আশায় এবং ফলোদ্দেশে যে দান করা যায়, এবং কষ্টের সহিত যে দান করা যায় তাহা রাজসিক দান। দেশকালপাত্র বিবেচনা না করিয়া সৎকার রহিত এবং অবজ্ঞাপূর্ব্বক যে দান করা যায়, তাহা তামসিক দান"।

গীতার এই অধ্যায়ে আহার, যজ্ঞ, তপস্যা প্রভৃতি, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিবিধ গুণানুসারে ত্রিধা বিভক্ত করা হইয়াছে। দানেরও এইরূপ তিন প্রকার ভাগ করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য

এই যে এই তিন প্রকার দানই লোকে করিয়া থাকে। কোন্-গুলি একেবারে পরিত্যজ্য (তামসিক দান), কোন্‌গুলি আপাততঃ উৎকৃষ্ট দান বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে পরিত্যজ্য বলিয়া বোধ হইবে (রাজসিক দান) এবং কোন্‌গুলি প্রকৃত অনুষ্ঠেয় দানকর্ম্ম (সাত্ত্বিক দান), ইহারই নির্দ্দেশ করা গীতোক্ত শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য।

এক্ষণে সাত্ত্বিক দান কি তাহা বুঝা যাউক। সাত্ত্বিকদান সম্বন্ধীয় শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ উপরে দেওয়া হইয়াছে। ইহার প্রথম উপাদান এই যে "দেওয়া উচিত" এই বোধ দাতার হওয়া চাই; নিরবচ্ছিন্ন কর্ত্তব্যজ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতেছি, এইরূপ জ্ঞান হওয়া চাই। দানের প্রকৃতপাত্র অর্থাৎ প্রকৃত দরিদ্র দেখিলেই দাতার পূর্ব্বোক্ত প্রকার জ্ঞান হইতে পারে। দ্বিতীয় উপাদান এই যে দানের পাত্র "অনুপকারী" হইবে। "অনুপকারী" এই কথাটির মানে টীকাকারেরা "প্রত্যুপকারে অসমর্থ," অথবা "যাহার প্রত্যুপকার করিবার সম্ভাবনা নাই" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। "অনুপকারী" কথাটার সোজা মানে এই, "যে ব্যক্তি উপকারী নয়" অর্থাৎ "যে অতীতে কোন উপকার করে নাই, বর্ত্তমানেও কোন উপকার করিতেছে না, এবং তাহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া যতদূর বোধ হয় তাহাতে বোধ হয় ভবিষ্যতেও সে কোন প্রকার উপকার করিতে পারিবে না"। উপরোক্ত দুই প্রকার অর্থের বেশী প্রভেদ নাই। উভয়েরই তাৎপর্য্য এই যে গ্রহীতা যেন প্রকৃত দরিদ্র হয় তাহা হইলে দাতার আর প্রত্যুপকার প্রাপ্তির কোন প্রত্যাশা থাকে না। এই উভয় উপাদান না থাকিলে সাত্ত্বিকদান ফলকামনাযুক্ত রাজসিকদানে পরিণত হইয়া পড়িবে। ইহার উপর আবার দেশকালপাত্র

বিবেচনা করিতে হইবে। এই দেশকালপাত্র লইয়াই বিশেষ গোলযোগ। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা বলেন "দেশ" মানে কুরুক্ষেত্রাদি পুণ্যভূমি, "কাল" অর্থাৎ গ্রহণ সংক্রান্তি প্রভৃতি পুণ্যকাল এবং পাত্র অর্থাৎ তপঃ স্বাধ্যায় সম্পন্ন ব্রাহ্মণাদি ব্যক্তি। এক্ষণে এই প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের ব্যাখ্যা মানিয়া চলিলে, কবে দাতা পুণ্যভূমি ভ্রমণে বাহির হইবেন, কবে গ্রহণ হইবে, কবে বেদ পারগ ব্রাহ্মণ আসিয়া দয়া করিয়া তাঁহাকে দেখা দিবেন এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া দান ধর্ম্মাচরণ স্থগিত রাখিতে হয়। পক্ষান্তরে এই নিদারুণ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ভারতবর্ষের কোন স্থানে যদি কেহ মাসের মধ্যভাগে জীর্ণশীর্ণ অন্নক্লিষ্ট ব্যক্তিকে কিছু দান করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করেন তাহা হইলে এই দান সাত্ত্বিক হইবে না। ইহা অসম্ভব এবং মানুষের সাধারণ বুদ্ধির বিরোধী। পরম পণ্ডিত স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন "প্রাচীন ঋষি এবং পণ্ডিতগণ অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন এবং মহা জ্ঞানী। তাঁহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি করিবে, কদাপি অমর্য্যাদা বা অনাদর করিবে না। তবে যেখানে বুঝিবে, যে তাঁহাদের উক্তি, ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ, সেখানে তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরাভিপ্রায়েরই অনুসরণ করিবে" (১)। বঙ্কিমচন্দ্র দেশকালপাত্রের সোজা অর্থ এইরূপ বুঝাইয়াছেন; "কথাটার অর্থ সোজা বুঝিবার জন্য হিন্দু ধর্ম্মের কোন বিশেষ বিধির প্রয়োজন করে না। বাঙ্গালা দেশ দুর্ভিক্ষে উৎসন্ন যাইতেছে, মনে কর সেই সময়ে মাঞ্চেষ্টরে কাপড়ের কল বন্ধ—শিল্পীদিগের কষ্ট হইয়াছে। এ অবস্থায় আমার কিছু দিবার থাকিলে দুই জায়গায় কিছু কিছু দিতে পারিলে ভাল

---

(১) ধর্ম্মতত্ত্ব।

হয়, না পারিলে কেবল বাঙ্গালায় যা পারি দিব। তাহা না দিয়া যদি আমি সকলই মাঞ্চেষ্টরে দিই তবে দেশ বিচার হইল না। কেন না, মাঞ্চেষ্টরে দিবার অনেক লোক আছে, বাঙ্গালায় দিবার লোক বড় কম। কাল বিচারও ঐরূপ। আজ যে ব্যক্তির প্রাণ তুমি আপনার প্রাণপাত করিয়া রক্ষা করিলে, কাল হয় ত তাহাকে তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিতে বাধ্য হইবে, তখন সে প্রাণদান চাহিলে তুমি দিতে পারিবে না। পাত্র বিচার অতি সহজ—প্রায় সকলেই করিতে পারে। দুঃখীকে সকলেই দেয়, জুয়াচোরকে কেহই দিতেচাহে না। অতএব "দেশে কালে চ পাত্রে চ" এ কথার একটা সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন নাই, যে উদার জাগতিক মহানীতি সকলের হৃদয়গত, ইহা তাহারই অন্তর্গত"।

"দেশ" অর্থ "স্থান"। যখন একাধিক স্থানে দান করা উচিত বোধ হয় তখন যে স্থানে কিছু দিলে অধিক উপকার হয় সেই স্থানেই দান করিবে। তাহা হইলেই দানের দেশ-বিচার হইল। এই বৎসরের প্রথমভাগে ভারতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা মধ্য-প্রদেশেই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অতিশয় দারুণ হইয়াছিল। যাঁহারা অন্যান্য স্থানে সাহায্য না করিয়া মধ্যপ্রদেশে দান করিয়াছিলেন তাঁহারাই দানের প্রকৃত দেশ বিচার করিয়াছেন। কাল বিচারও এইরূপ। দেখিতেছি, কোন বৎসর প্রচুর শস্যোৎপত্তি হইয়াছে, দানের বিশেষ আবশ্যক নাই, তখন কাহাকেও কিছু দিলাম না। আবার শস্যাভাবের সময় যথাসাধ্য দান করিলাম। তাহা হইলেই কালবিচার হইল। পাত্র সম্বন্ধেও এইরূপ। যে ব্যক্তি দুটি পয়সা দান লইয়া দুছিলিম গাঁজা কিনিয়া খাইবে অথবা শৌণ্ডিকালয়ে গিয়া মদ্যপান করিবে তাহাকে কেহই কিছু দিবে না।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সেই পয়সা দুটি লইয়া অন্নক্লিষ্ট শিশুসন্তানটির আহার্য্য কিনিয়া দিবে সকলেই ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে যথাসাধ্য দিবে। এই গেল সোজা কথা। ইহাতে, কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা গ্রহণ সংক্রান্তি ব্রাহ্মণ বৈশ্য কিছুরই বিচার আবশ্যক করে না। তবে এক্ষণে কথা হইতেছে যে এই ঋষিপ্রতিম ভাষ্যকারেরা এমন উদার কথার এত সঙ্কীর্ণ অর্থ করিলেন কেন। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় ভাষ্যকারদিগের অর্থের কিয়ৎপরিমাণে সমীচীনতা আছে। প্রথম কথা—আমাদের শাস্ত্রগন্থের প্রক্ষিপ্ত বচনের এত ছড়াছড়ি যে খাঁটিশাস্ত্র কোন্‌টুকু তাহা বাচিয়া লওয়া বড় দায়। শঙ্করাচার্য্য অথবা শ্রীধরস্বামীর ভাষ্য যে আমরা অখণ্ড পাইয়াছি তাহার প্রমাণ নাই। নকলের নকল তাহার নকল এইরূপ পুরুষানুক্রমে রূপান্তরিত হইয়া আদিভাষ্য এবং টীকার অনেকস্থল বোধ হয় আমাদিগকে হারাইতে হইয়াছে। তাহার পর কোন স্মৃতিশাস্ত্রাভিমানী পণ্ডিতের হাতে পড়িয়া গ্রহণসংক্রান্তি প্রভৃতি যে দেখা দিয়াছে এরূপ কথা খুব সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ যদি মানিয়াই লই যে কুরুক্ষেত্র গ্রহণাদি ভাষ্যকারদিগের আলিখা তাহা হইলেও তাহার কিছু তাৎপর্য্য আছে। একটা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতেছি। প্রথমে দেশ অর্থে ভাষ্যকারেরা বলিতেছেন কুরুক্ষেত্রাদির ন্যায় পুণ্যস্থান। কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি আমাদের দেশের পুণ্যস্থান। এখানে আসিলে চিত্তশুদ্ধি জন্মে, হৃদয়ের পবিত্রতা বৃদ্ধি হয়। এরূপ কেন হয় তাহার সবিস্তার বিচার এস্থলে সম্ভব নয়। তবে এক্ষণে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে যেখানে কত সহস্র যুগযুগান্তর ধরিয়া, বৎসরে বৎসরে মাসে মাসে দিনে দিনে লক্ষ লক্ষ সাধুমহাজনের সমাগম হয়, যে স্থলে এত অসংখ্য পুণ্যাত্মার পবিত্র পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়, সে স্থলে মনে হয় যেন পবিত্রতা

মূর্তিমতী হইয়া পুঞ্জীভূতা হইয়া রহিয়াছে সে স্থলের ধুলিরাশিতে, বায়ুমণ্ডলে, চেতন অচেতন প্রত্যেক পদার্থের অণু পরমাণুতে, চতুর্দ্দিগন্তে যেন পবিত্রতা জড়ীভূতা হইয়া রহিয়াছে। কত অসংখ্য পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ সেই স্থানকে পবিত্র করিয়াছেন, শুদ্ধ এই অতীতের স্মৃতিতেই হৃদয় পুণ্যময় হয়, পুলকে ভরিয়া যায়। এক্ষণে মনে করুন এইরূপ এক পবিত্র স্থানে, ধরুন, গঙ্গাতীরে, পবিত্র দেবালয় সমীপে একজন প্রকৃত দরিদ্র দান যাচ্ঞা করিতেছে। আর এক ব্যক্তি ঠিক এইরূপ অবস্থাপন্ন সমান দরিদ্র; কিন্তু সে শৌণ্ডিক পল্লীতে শৌণ্ডিকালয়ের সম্মুখে দান মাগিতেছে। এক্ষণে যদি দাতার একজনকেই মাত্র দেওয়ার ক্ষমতা থাকে, তবে কাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। দেশ বিচার করিলে আমার বিবেচনায় যে ব্যক্তি পবিত্র জাহ্নবীতীরে ভিক্ষা যাচ্ঞা করিতেছে তাহাকেই দেওয়া উচিত। তাহার প্রথম কারণ এই যে, যে ব্যক্তি পবিত্র স্থানে রহিয়াছে তাহার অন্তঃকরণ পবিত্র ভাবাপন্ন। খুব সম্ভব সে দানের সদ্ব্যবহার করিবে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি হয় ত অপবিত্র বাহ্য আবরণের আকর্ষণপ্রভাবে কলুষিত চিত্ত হইয়া দাতার অর্থের অপব্যবহার করিবে—হয় ত মদ্যপানে প্রবৃত্ত হইবে। মানবপ্রকৃতির উপর বাহ্যপ্রকৃতির আকর্ষিণীশক্তি অতীব ভয়ঙ্করী। দ্বিতীয় কারণ এই যে চিত্তশুদ্ধিকর স্থানে দাতার মনোভাব পবিত্র হয় বলিয়া এই জাহ্নবীতীরস্থ দরিদ্রকে দান করিলে তাহার দয়ারূপ মনোবৃত্তির ক্রমবিকাশের অধিক সম্ভাবনা। অর্থাৎ তাঁহার এইরূপ সাত্ত্বিকদান করিবার প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবার অধিকতর সম্ভাবনা। চিত্তের নির্ম্মল অবস্থায় মানসিকবৃত্তিগুলির সমধিক অনুশীলন হওয়ার কথা। চিত্তের প্রসন্নতা হইলে কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করা যায়; ফলকামনার

সম্ভব থাকে না। এই উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে না যে দেওয়া উচিত বোধে যে সে স্থানে অনুপকারীকে দান করিতে হইবে না। সে সাধারণ বিধি সর্বত্র সর্ব্বকালে চলিবে। উদাহরণ কথিত দেশবিচারের অবসর অবশ্য সচরাচর হয় না। কাল-বিচার সম্বন্ধেও এইরূপ কথা। পবিত্র মুহূর্ত্তে দান করিলে দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই আত্মোন্নতির পক্ষে মঙ্গল। এক্ষণে পাত্র বিচারের কথা। ভাষ্যকারেরা তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে দান করিতে বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য কি? এক কথা এই বলা যাইতে পারে যে ভারতবর্ষে এক সময়ে বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ-তনয়ের ভিক্ষাই একমাত্র জীবিকোপায় ছিল। তাঁহারা অদ্ভুত ক্ষমতাপন্ন, সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন অথচ তাঁহারা প্রকৃত দরিদ্র ছিলেন। এরূপ "অনুপকারী" প্রকৃত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দান করিলে তাহা সাত্ত্বিক বলিয়াই পরিগণিত হইবে। দ্বিতীয় কথা এই প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদি সবিশেষ আলোচনা করিলে অনেক স্থলে বুঝা যায় ব্রাহ্মণ জাতিবিশেষ নহে; শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রকেই ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। এ হিসাবে ইয়োরোপীয় কোন গুণ-বান্ ম্লেচ্ছও ব্রাহ্মণপদবাচ্য হইতে পারে। কথাটার আসল মানে এই গুণসম্পন্ন ভাললোককে দান করিবে, জুয়াচোর গাঁজাখোরকে দিবে না। এরূপ পাত্র বিচার সকলেই করিয়া থাকে। বিচারও সহজ। দু একবার পরীক্ষা করিয়া পাত্রের গুণাগুণ সহজেই টের পাওয়া যায়। কলিকাতার ট্রামওয়ের ধারে, গঙ্গাতীরে, নামাবলী গায়ে উপবীতধারী দু একজন লোক্ একাদশী অমাবস্যার দিনে দান মাগিয়া থাকে। গুটিকতক পয়সা জমিলেই তাহারা গুলির দোকানে গিয়া আড্ডা করে। ইহাদিগকে প্রায় সকলেই চিনে এবং কেহই কিছু দান করে না। এইরূপ আরো রি ভূরিভূ

উদাহরণ দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে যে দানের সাধারণ বিধি ভাষ্যকারদিগের অর্থের প্রকৃতপক্ষে তত বিরোধী নয়। স্থল-বিশেষে এবং সময়বিশেষে ভাষ্যকারদিগের কথা মানিয়া চলিলেই মঙ্গল।

দানধর্ম্ম এত কঠিন বলিয়াই সাত্ত্বিকদান জগতে বড় বিরল। দাতার উপযুক্ত শিক্ষা বা self-culture চাই; বহুদিন ব্যাপিনী সর্ব্ববিষয়িনী শিক্ষার প্রয়োজন। প্রফুল্ল ওরফে দেবীচৌধুরাণী অনেক শিক্ষার পর তবে সাত্ত্বিকদান করিতে শিখিয়াছিলেন। এইরূপ সাত্ত্বিকভাবে দান করিতে পারিলেই তবে জীবনের কর্ত্তব্যের একাংশ সম্পাদিত হয় অর্থাৎ পুণ্য বা ধর্ম্মাচরণ হয়। জ্ঞানী, তত্ত্বদর্শী গুরু সংশিষ্যকে যে নিঃস্বার্থ উপদেশ দান করেন তাহাও আমাদের দেশে নিষ্কাম দান। অন্যান্য প্রকার নিষ্কামদান জগতে বিরল বলিয়া নিষ্কামদানের অনেকগুলি উপাখ্যান মাত্র আমরা শুনিতে পাই। শ্যেনকপোতীর উপাখ্যান, নাগানন্দ, জীমূতবাহনের উপাখ্যান প্রভৃতি সাত্ত্বিকদানের উদাহরণ। পুরাণ কথিত বলিরাজার দান বোধ হয় ঠিক সাত্ত্বিক নয়। শেষকালে হয় ত তাঁহার "যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্যে" এইরূপ ভাব হইয়াছিল। তাই ভগবান্ তাঁহাকে পাতালপুরে বদ্ধ করিয়াছিলেন। সকল কর্ম্মেরই সীমা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য আছে।

দুর্ভিক্ষাদিতে দান করিলেই সাত্ত্বিকদান হয় না, দেশকালপাত্র বিচার করিলেই সাত্ত্বিকদান হয় না; এই সব কথা বুঝাইবার জন্যই রাজসিক ও তামসিক দানের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। রাজসদান জগতে বড়ই প্রবল; তাই রাজসদান একটু ভাল করিয়া বুঝা উচিত। প্রথম কথা এই যে দাতা যেখানে প্রত্যুপ-কারের আশা করেন সেখানে তাঁহার দান দেশ কাল পাত্র বিচার

করিয়া করিলেও এবং প্রকৃত দরিদ্রকে দিলেও তাহা সাত্ত্বিক হইবে না, রাজসিক হইবে। যদি প্রত্যুপকারই চাহিলাম তাহা হইলে ভগবানের উদ্দেশে দান করিলাম না নিজের উদ্দেশ্যেই দান করিলাম; কাজে কাজেই দান নিকৃষ্ট হইল। এই কথাটি "ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ" এই দ্বিতীয় কথা দ্বারা পরিস্ফুট হইয়াছে এবং ইহারই অন্তর্ভূত। ফলকামনা করিলেই আত্মোন্নতির পথে কাঁটা পড়িল, পুণ্য হইল না, ধর্ম্ম হইল না। গৃহীতার নিকট হইতে প্রত্যুপকার ব্যতীত অন্য ফলোদ্দেশেও অনেক লোক সচরাচর দান করিয়া থাকে। দুর্ভিক্ষের সময় জমিদার কি মহাজনবাবু এককালীন অনেক টাকা দান করিয়া ফেলিলেন। লোকে মনে করিল বাবু কি চমৎকার লোক, কেমন সাত্ত্বিকদান করিলেন, এই রকমই করিতে হয়। সংবাদপত্রে বাবুর যশঃ বিঘোষিত হইতে লাগিল, (বাবুরই বিশেষ চেষ্টায়), বাবু কত অনাথের প্রাণ রক্ষা করিলেন। বাবু কিন্তু সে দিক্ দিয়াও যান নাই। বাবু রায় বাহাদুর কি রাজা বাহাদুর হইবার স্বপন দেখিতেছেন। দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে স্বকার্য্যসিদ্ধির জন্য হঠাৎ একটা বড় রকম দান করিয়া ফেলিলেন। টাকাটা যে কোথায় গেল, ভূতের পিতৃশ্রাদ্ধ হইল, কি প্রকৃত দরিদ্রদিগের নিকট পৌঁছিল সে বিষয়ে লক্ষ্য নাই; উৎসুক হইয়া রোজ খবরের কাগজ হাঁ করিয়া দেখিতেছেন, কে কি বলে। হয় ত নিজেই সংবাদপত্রে টেলিগ্রাফ করাইলেন, নিজের খুব সুখ্যাতি গাইলেন। যদি রায় বাহাদুরী, রাজা বাহাদুরীটা ভাগ্যে মিলিয়া যায়। ইহাকে সাত্ত্বিকদান বলে না, ইহাই ফলকামনাযুক্ত প্রকৃত রাজসিকদান। কোন কোন রাজা জমিদার আবার প্রাণের দায়ে দান করিয়া থাকেন। বাবুর অত্যাচার কাহিনী হয় ত গবর্ণমেণ্টের কাণে

গিয়াছে; মাজিষ্ট্রেট্ পুলিস্, বাবুকে পাকড়াও করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বাবু বেগতিক দেখিয়া ডফারিণ ফণ্ডে হঠাৎ দশ হাজার টাকা দিয়া ফেলিলেন। গবর্ণমেণ্টে তখন বাবুর ভারি সুখ্যাতি হইয়া পড়িল, রাজকর্ম্মচারীরাও একটু নরম হইলেন, মনে করিলেন বাবুর নামে দুষ্ট লোকে হয় ত মিথ্যা অপবাদ রটাইয়াছে। বাবু সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন। ইহাও সেই সকাম রাজসিক দান। বাঙ্গালা দেশে এইরূপ দানেরই বড় ছড়াছড়ি। রাজসিকদানের আর একটি তৃতীয় কথা আছে। সেইটি বড়ই সুন্দর। "দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং" এই কথাটির দ্বারা রাজসিকদানের ভেদ করাতে সাত্ত্বিকদান আরো পরিস্ফুটরূপে বুঝা যাইতেছে। সৎপাত্রে দাও প্রকৃত দরিদ্রকে দাও; কিন্তু দেবার সময় দাতার মনে যদি কোন ক্লেশ হয় তাহা হইলে আর দান সাত্ত্বিক হইল না। এটি বড় উচ্চদরের কথা। ঈশ্বরোদ্দেশে যে কোন কর্ম্ম করা যায় তাহা করিবার সময় কৃতীর মনের ভাব সর্ব্বতোভাবে পরিশুদ্ধ হওয়া চাই। নিজের মনে যদি কোন গোল রহিল তাহা হইলে কর্ম্ম আর নিষ্কাম হইল না। কষ্টেস্হষ্টে কিঞ্চিৎ দিলে দান সাত্ত্বিক হইল না। প্রসন্নচিত্তে দান কর তবেই প্রকৃত দান হইবে। সাত্ত্বিকদানের লক্ষণে যে "কালে" কথাটার উল্লেখ আছে তাহা এই খানেই বেশ বুঝা যাইবে। যেসময়ে দান করিলে মনের ভিতর কোনরূপ অপ্রসন্নতা থাকিতে পারে না সেই সময়ে দানই "কালে" দান। সংক্রান্তিগ্রহণাদিতে চিত্তের প্রসন্নতা পবিত্রভাব বৰ্দ্ধিত হইতে পারে। অতএব এই রূপ পবিত্র মুহূর্ত্তে দান করিলে চিত্তের আর পরিক্লেশ থাকিবে না, তাহা হইলেই দান রাজসিক না হইয়া সাত্ত্বিক হইবে।

তারপর তামসিকদানের কথা। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট;

দান নামের যোগ্য নয় বলিলেই হয়। যাহা দেশ কাল পাত্র বিচার না করিয়া দেওয়া যায় তাহাই তামস দান। কোন বাবু হয় ত সুরাপানে বিহ্বল হইয়া অর্দ্ধ অজ্ঞানাবস্থায় একটা অপাত্রকে একখানা ইমারতই দান করিয়া ফেলিলেন। ইহাকেই বলে তামসিকদান। এইরূপ দানে জগতের বড়ই অহিত হয়। গৃহীতাকে গালি দিয়া মন্দ বলিয়া যে দান করা যায় তাহাও তামসিকদান। কোন বাবু হয় ত দ্বারে ভিখারী আসিলে তাহার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া পরে মুষ্টিমেয় ভিক্ষা দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। অনেক এদেশস্থ সাহেব-দাতার এইরূপ রোগ আছে। অনেক ভিখারীকে হয় ত কখন কখন উত্তম মধ্যম প্রহার খাইয়া দান গ্রহণ করিতে হয়। ইহাও তামসিকদান।

তামসিকদানে দাতা ও গৃহীতা উভয়েই পাপের ভাগী; অর্থাৎ কাহারও আত্মোন্নতি হয় না। ইহা জগতের অহিতকর এবং একেবারে পরিত্যাজ্য। রাজসিকদানে পৃথিবীর কিয়ৎপরিমাণে হিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা নিষ্কাম নহে বলিয়া পরিত্যাজ্য। সুশিক্ষার বিস্তারে রাজসিকদান করিতে করিতে ক্রমশঃ সাত্ত্বিকভাবে দান করিতে শেখা যাইতে পারে। নিষ্কামভাবে সৎপাত্রে দান করাই সাত্ত্বিক অর্থাৎ প্রকৃত দান। ইহাতেই জগতের মঙ্গল, এবং ইহাই ঈশ্বরাভিপ্রেত দান। সাত্ত্বিকদানের বিস্তারে এই পৃথিবীর মানুষই কালে দেবতা হইবে।

"খিচুড়ী"—সমালোচনা

বঙ্কিম বাবুর "বঙ্গদর্শনে"র পর বাঙ্গালা সাহিত্যে স্বাধীন এবং সরস সমালোচনা বড়ই বিরল হইয়াছে। এখন "mutual admiration society"র অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। যাঁহার কোষ্ঠীতে কোনকালে পাণ্ডিত্য লেখে না, তিনি স্বগুণানুরূপ বন্ধুর কৃপায় পরম পণ্ডিত। যাঁহার বিদ্যা ফোর্থ ক্লাস পর্য্যন্ত, যিনি ইংরাজী বাঙ্গালা সংস্কৃত কিছুই জানেন না, ব্যাকরণের ধার ধারেন না, অলঙ্কারের সম্পর্ক রাখেন না, তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের লেখক। এইরূপ লেখকেরাই পরস্পর পরস্পরের সমালোচনা করিয়া থাকেন। ইঁহারা কখন কখন প্রকৃত প্রতিভাশালী লোকদিগকে অযথা গালি দিয়া স্বাধীন সমালোচনার পরিচয় দিয়া থাকেন। স্বার্থপরতা অধুনাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। যেখানে স্বার্থপরতা নাই, সেখানে চক্ষু লজ্জা আসিয়া তুল্যরূপ অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে। বঙ্কিম বাবুর "বঙ্গদর্শনের" আমলের কোন কোন শ্রেষ্ঠ লেখক আজিও জীবিত আছেন। কিন্তু তাঁহারা বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া প্রাচীন নীতি অনুসারে শোভনমৌন অবলম্বন করিয়াছেন। এহেন দিনে যিনি কোনরূপে স্বার্থ প্রণোদিত না হইয়া সাহিত্য কিম্বা men and manners সম্বন্ধে দু চারিটা সরস মধুর কোমল সত্য কথা বলিতে পারেন, তিনি দেশের একজন যথার্থ হিতকারী, এবং আমাদের একটা প্রকৃত অভাব মোচনে সমর্থ। আমাদের আলোচ্যমান পুস্তিকা "খিচুড়ী"র লেখক বহুল পরিমাণে এই অভাব পরিপূরণ করিয়াছেন। ক্ষুদ্র "খিচুড়ী" নানা বিষয়ে সরস এবং সত্য সমালোচনার

অবতারণা করিয়া দেশের একটু উপকার করিয়াছে, মনে হইতেছে।

"খিচুড়ী"র লেখক কবি। মধ্যে মধ্যে 'নব্যভারত' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখেন, তাহার অনেকগুলি সুমিষ্ট ও সুন্দর, তাই কবিতায় এই পুস্তিকা লিখিয়াছেন। ব্যঙ্গের সুর একটু সুন্দর করিবার জন্য মাঝে মাঝে বেশ ইংরাজী কথা সংমিশ্রিত করিয়াছেন। এই হিসাবে কবির ভাষা কিয়ৎপরিমাণে খিচুড়ীজাতীয়। বর্ণনীয় বিষয়ও "খিচুড়ী"—নানাজাতীয়। আলোচ্যমান গ্রন্থে দেশের বিবিধ লোকের চরিত্র চিত্র ও সমাজচিত্রের বর্ণনা আছে। এই সকল চিত্র কোন বিশেষ নিয়মে সংলগ্ন নহে। লেখকের যখন যাহাকে মনে পড়িয়াছে, তখনই তাঁহার ছবি আঁকিয়াছেন। অধিকাংশ ছবিই বর্ত্তমান জীবিত লেখকদের। গ্রন্থের সুর ব্যঙ্গপ্রধান হইলেও কবি মাঝে মাঝে খুব serious হইয়াছেন। তাঁহার ব্যঙ্গের মধ্যে কোথাও অতিরিক্ত তীব্রতা অথবা অযথা আক্রমণ নাই। বায়রণের মত personal ও নহে। সেরূপ কারণও নাই, কাজে কাজেই সেরূপ কার্য্যও নাই। কবি কোনরূপ স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া এই গ্রন্থ লিখেন নাই। এইজন্য গ্রন্থ মধ্যে serious এবং satiric এর অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ আছে। গ্রন্থখানি serio-satiric বলিয়া ইহার "খিচুড়ী" নাম সার্থক হইয়াছে।

লেখকের পর্য্যবেক্ষণশক্তি অপরিসীম এবং সূক্ষ্ম, তিনি বহু বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালাদেশের এক অজ্ঞাতনামা প্রান্তভাগে জীবন কাটাইতেছেন; কিন্তু চারিদিক্ বেশ করিয়া দেখিতেছেন, অবস্থা বেশ বুঝিতেছেন। দেখিয়া দেখিয়া যাহা দোষের মনে করিয়াছেন, তাহারই তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন; এবং যাহা ভাল মনে

করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত সুখ্যাতি করিয়াছেন। ব্যঙ্গের স্বরে কবির ভাষায় বর্ত্তমান সমাজের এবং বিশেষভাবে কোন কোন লেখকদের ও সমাজপরিচালকদের দোষ দেখাইয়া দিয়াছেন। যাহার যেটুকু সুন্দর, তাহাও সরল প্রাণে সরল ভাষায় বলিয়াছেন। এক কথায় তিনি বাঙ্গালাদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত "survey of mankind" লিখিয়াছেন। কবি এক জায়গায় কোন লেখককে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন,

"মিষ্ট করে স্পষ্ট বল্‌বে
চাইবে না কারো মুখপানে।
রং দেখে ভাই ভুলনাকো
চল্‌ছে মেকি সব খানে॥

কবি নিজে এই উপদেশ বাক্য বরাবর স্মরণ করিয়া চলিয়াছেন। তিনি কাহারো মুখ পানে না তাকাইয়া মিষ্ট করিয়া স্পষ্ট বলিয়াছেন। তবে তাঁহার সকল স্পষ্ট কথার সহিত আমরা সব সময়ে একমত হইতে পারি না। ভুল এবং মতভেদ সকলেরই আছে। আমাদের লেখক দু চার জন প্রাতঃস্মরণীয় মহৎ লোকের প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচয় ভাল করিয়া পান নাই। পক্ষান্তরে দু এক জন নিতান্ত অজ্ঞাতনামা কুলেখককেও নিজপরিচিত বলিয়া গ্রন্থ মধ্যে স্থান দিয়া বাড়াইয়া ফেলিয়াছেন। আবার অনেকগুলি ক্ষমতাশালী লেখকের সহিত তাঁহার পরিচয় না থাকাতে তিনি আদৌ তাহাদের উল্লেখ করেন নাই।

যাহা হউক, মোটের উপর আমরা নির্ভয়ে বলিতে পারি, গ্রন্থখানি বেশ সরল ও সুন্দর হইয়াছে। তাঁহার ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল ও সুললিত। তিনি কাহারও অনুকরণ করেন নাই। ব্যঙ্গের সময় তিনি ভাষার একটু নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। ভাবগুলি

যেন আপনা আপনি আসিয়া দেখা দেয়। তাঁহার সংক্ষিপ্ত মত-গুলি অধিকাংশস্থলে বিজ্ঞজন অনুমোদিত হইবে। মাঝে মাঝে আমরা নমুনা দেখাইতেছি।

বাঙ্গালায় প্রেমের বন্যার পর কেহ কেহ বীররসের আমদানী করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের কবি তাহার চিত্র দিয়া জনান্তিকে বলিতেছেন—

"স্বার্থের ভাঁড় বাঁধা আছে
গলে আমাদের,
ধারে পেলে ঐ রসটা
কিনি দুচার সের।
অকাতরে দেশের তরে
প্রাণটা দিতে ঢেলে।
সূর্য্যি পক্ক্ কোন্ দেশেতে
এমন মানুষ মেলে?"

তারপর দেশের ভণ্ডামিতে বিরক্ত হইয়া কবি বলিতেছেন,

"বস্তা বস্তা ভণ্ডামি বল
কোথা হতে এল দেশে,
বালিকা ভণ্ড বালক ভণ্ড
ভণ্ড, পক্ককেশে।"

Joint Familyর "দ্বন্দ্বরাগ" কবিতায় ব্যঙ্গের ভাষায় বড় সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে,

"শান্তি ঢালা এমন বিবাদ
অলঙ্কারের শিঞ্জন,
কত যুগ ধরি' রয়েছে অমৃত
করিছে শ্রবণ রঞ্জন।

এইরূপে আমাদের লেখক, সাহেবিয়ানা, sentimentality, anti-sentimentality, উপাধিব্যাধি, মৌখিক নিষ্কামধর্ম্ম প্রভৃতি নানাবিধ সামাজিক দোষের সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন। অনেকে এই ব্যঙ্গ-দর্পণে নিজ মুখচ্ছবি দেখিয়া লজ্জিত হইবেন এবং নিজ নিজ দোষ সংশোধনে যত্নবান্ হইবেন। কবিও একবার একটু furious হইয়া serious ভাবে বলিয়া ফেলিয়াছেন;—

"শকুন্তলার ত্রুটি ধরা
দুর্ব্বাসা কি নাইকো আর?
একবার এসে অভিশাপে
ভস্ম করে ম্লেচ্ছাচার।"

বাঙ্গালা সাহিত্যের "mutual admiration society" সম্বন্ধে লেখক বলেন,

"এদের গুণটা ওরা গায়গো
ওঁদের গুণটা এঁরা।
এরাই বলে সুসাহিত্যে
চিঁড়ের বাইশ ফেরা।"

অন্য জায়গায় বলিয়াছেন,—

"বাংলা মুলুকে সেই বড় হয়,
যাহারা কেবল ঢাক পিটোয়,
সাপ্তাহিকেতে আত্মগরিমা
জাহির করিয়া সাধ মিটোয়।"

এটা অবশ্য বিলাতী আমদানী। সেখানেও খুব মেকী চলিতেছে। তবে সেখানে ধরা পড়ে শীঘ্র। এখানে struggle for existence বড় বেশী। কে কার খবর রাখে? তবে সময়ে মেকী ধরা পড়িবে। চমৎকার অন্নচিন্তা হইতে একটু অবসর

পাইলেই বাঙ্গালী আসল চিনিবে, মেকী ফেলিয়া দিবে। তবে কিছুদিন লম্বকর্ণের প্রশ্রয় বাড়িবে। ততদিন,—

"বিদ্যালয়ের গুরু ছাড়া
সবাই বুদ্ধিমান্
তিনিও sharp তিনিও shrewd
যাঁর লম্ব কাণ।"

"খিচুড়ী" লেখক রুই কাতলা হইতে চুণো পুঁটি পর্য্যন্ত সকল প্রকার লোকেরই ছবি আঁকিয়াছেন। বড়দের ছবি সংক্ষিপ্ত এবং অস্ফুটন্ত, কিন্তু ভাষার গুণে বড় সুন্দর হইয়াছে। একটা নমুনা এইঃ—

"Primed muzzle রাসবিহারী
Low গমনের triform,
ধর্ম্মভীরু Justice বন্দ্যো
Duty করেন Perfrom.

গ্রন্থকার, Justice Ghose, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত W. C. Bonerji, সুরেন্দ্র বাবু, বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি অনেকেরই এইরূপ সুকবিসঙ্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবি আঁকিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের লেখকদিগের প্রতিই একটু বেশী সমাদর দেখাইয়াছেন। সকলেরই দোষ গুণ উভয়ই দেখাইয়াছেন। কাহারো মুখপানে তাকান নাই। নিজের স্বাধীন মত স্পষ্ট ও সুন্দর করিয়া বিবৃত করিয়াছেন। তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, বাঙ্গালার সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ও ভালরূপ পড়াশুনা আছে। আমরা ক্রমে তাহার কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি। বর্ত্তমান বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবিকে বলিয়াছেন,

নামে রবি, "ভাষায় যেন
চাঁদের সুধা ঢালা,
ময়ূখ অঙ্গে মধুর গন্ধে
নিখিল বঙ্গ আলা !!"

আবার একটু ব্যঙ্গভাবে রঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন,

"শুনান তাহারে পিরীতির কথা
বলেন 'আমবনে নিতি আসিও,"
"আমি নিশিদিন তোমা ভালবাসি,
তুমি অবসর মত বাসিও।"

কবি দ্বিজেন বাবুকে ভালোয় মন্দয় কিঞ্চিৎ বলিয়া আমাদের গ্রন্থকার অন্যত্র বলিয়াছেন,

আমরা বলি দ্বিজেন ভায়া
খলের কথায় হও কালা।
তুমি মন্দ তারাই বলে
মরে যাদের গা'র জ্বালা।

শ্রীশবাবুর মার্জ্জিত রুচির কথা বলিয়া, কবি তাঁহার সম্বন্ধে রবিবাবুর ভাষায় বলিয়াছেন,—

লেখার মাঝে প্রসাদ গুণটি
ছত্রে ছত্রে জাগে,
ভাষা যেন তাকিয়ে থাকে
ভাবের অনুরাগে।

দেবীপ্রসন্ন বাবুর সম্বন্ধে গ্রন্থে আছে,

"দেবী বাবু ব্রাহ্ম-সাপের
ফণা দেন মুচড়ে।"

আমাদের বিদুষী রমণীদের যেটুকু প্রশংসা করিবার, কবি তাহা

করিয়াছেন। সবদেশেই পুরুষ লেখকেরা রমণী লেখিকাদের আপোষে একটু নিন্দা করিয়া থাকেন। স্বয়ং কমলাকান্তও মালার আধখানা বই বেণী দেখেন নাই। এটা একটা রঙ্গমাত্র। কাজের কথা নয়। তাই আমাদের কবি বলিয়াছেন,—

নীল মোজাতে ননীর ভাষায়
লেখে নবীন গাথা
পড়্‌তে বড়, মিষ্ট লাগে
অর্থে ঘোরে মাথা।

দু একজন উদীয়মান পুরুষ-কবি সম্বন্ধেও একথা বেশ খাটে। কবি পরক্ষণেই দেশের জনকতক বিদুষী লেখিকার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছেনঃ—

ভাষা-সরিতে উচ্ছমশীলা
"সরলা" বরলারূপিণী
আর অশ্রুকণার কলাবতী সতী
কোবিদ হৃদয়মোহিনী।

দেবী প্রিয়ম্বদা—

বীণার স্বননে স্তব্ধ নিশায়
বরষে মাধুরী ধারা,
সে মধু মুরলী মরমে পশিলে
হয়ে পড়ি নিজহারা।

"আলো ও ছায়ার" কথা গ্রন্থ মধ্যে কোথাও দেখিলাম না। তাহা থাকিলে চিত্রগুলি সম্পূর্ণ হইত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেখানে প্রশংসা প্রাপ্য, সেখানে উপযুক্ত প্রশংসা করিয়াছেন এবং যেখানে দোষ আছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। যেখানে একটু অতিরিক্ত বলিয়াছেন,

সেখানে তাঁহার ছন্দের বাঁধুনী এবং শব্দ যোজনার সৌন্দর্য্য সমালোচ্যমান দোষকে মোলায়েম করিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রদর্পণে অনেক লেখক যথার্থ স্ব স্ব মূর্ত্তি চিনিয়া লইতে পারিবেন; কিন্তু এই কবিতাময় মধুর বাণ-বর্ষণে কেহই তীব্রতা অনুভব করিতে পারিবেন না এবং হাসিতে হাসিতে নিজের দোষ শোধ্‌রাইতে পারিবেন।

জনকতক so-called উদীয়মান লেখককে কবি সুন্দর কবিতাময় ভাষায় তাঁহাদের যাহা প্রাপ্য, তাহা দিয়াছেন। একখানি সম্বন্ধে আমাদের কবি বলেন,

ইথে Bathos আছে, Pathos আছে—
কমা, সেমি—রেথা

আর একখানি কেতাব সম্বন্ধে,

ইথে "saffron" আছে মস্‌লা আছে—
আছে কাশ্মীরি চাল,
ঘের্‌তো টুকু জুটলে পরে
কেউ দিতনা গা'ল।

আর একজন লেখক সম্বন্ধে আমাদের কবি বলেন,—

"যশের পথটি বক্র হলেও
ইঁহার কাছে ঠিক সোজা।"

অন্যত্র আর একখানি তথা-কথিত গবেষণাপূর্ণ কেতাব সম্বন্ধে,—

"অন্ধকারে ডুব দিয়ে ভাই
Fact তুলেছ যত
দেড়বুড়ি তার imaginary
এক বুড়ি তার হত।"

আজ কাল এক শ্রেণীর লেখকেরা ইংরাজীর একটা বিট্‌কেল্

তরজমা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি করিতে চান। তাহার একটা নমুনা এইরূপ ; "তিনি আমার খরচে খুব হাসিয়া লইলেন।" এই-রূপ শ্রেণীর লেখক সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেন ;

ভাবগুলি পড়ে শুধু মনে হয়
সাহেব পরিয়া ধূতি চাদর,
ভাষার বনেতে করিছে ভ্রমণ
সেজে গুজে যেন দেশী বাঁদর।

Pseudo-critic এর জ্বালায় অনেক বড় বড় প্রতিভাশালী লেখক জ্বালাতন। তাই হঠাৎ সমালোচক সম্বন্ধে কবি বলেন ;—

সে দিন দেখেছি যেমন তেমন
হঠাৎ কোথায় যাচ্ছ,
এমন মধুর পাইলে বিদ্যা
অমৃত সদৃশ-স্বাদু ;
বস্তাখানিক কিন্তু কিনেছ
শিখেছ তীব্র বাণী,
ইহারি বলেতে টানিছ মিত্র,
সমালোচনের ঘানি।

কবি ইঁহাকে একটু তীব্র ভাবেই বলিয়াছেন,—

তোমার ওই,

হরিৎ বরণ cheese টুকুনি
দেখিয়ে দিলেই হবে।
যত্ন করে ঘাড় বাঁকিয়ে-
রোমন্থিবে সবে।

একজন প্রতিভাশালী লেখকের ক্ষুদ্র সমালোচককে বলিয়াছেন,—

Maggot critic sweet brain এর
Genius পানে বেঁচে রয়।"

অন্য কবি সম্বন্ধে বলেন,

ভাইকে ভাবে পরের মত,
পরকে ভাবে আপন ভাই।

* * * *

উঠিয়ে দিচ্ছে মাতৃভক্তি
শুধু শিখচে শক্তি পূজা।

আমাদের Pseudo-historian মহাশয়েরাও বাদ যান নাই। সাহেবের কেতাব হইতে চুরি করিয়া আবার সেই সাহেবকে গালি না দিলে গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস হয় না। উদাহরণ যথা,—

"সাহেবগুলোর কালির দোষে
সিরাজ ছিল ঢাকা,
ঘ'সে মে'জে ক'ল্লে তারে
কোজাগরের রাকা।"

যাঁহারা রঙ্গালয়ের জন্য নাটক লিখেন, তাঁহাদের অনেকেরই বেশ নাটকীয় ক্ষমতা আছে; কিন্তু দর্শকমণ্ডলীকে খুসী করিতে গিয়া অনেক সময়ে তাঁহারা অনেক নাটক বিকৃত করিয়া ফেলিতেছেন। তাই আক্ষেপ করিয়াছি এক জনকে উপলক্ষ করিয়া কবি বলিতেছেন,—

রথের মত তোমায় টানে
দর্শকের দল।

* * * *

বনের পাখী, খাঁচার মাঝে
চিরদিনই র'লে,

হাততালিতে চিরদিনই
গেলেরে ভাই গ'লে !
প্রতিভা তোমার, নে'চে নে'চে চলে
গ্যাসালোকে শুনি হাত তালি,
দারিদের ধন, বাঙ্গালা ভাষাটা
কর্‌তেছ কেন মিসকালি”?

আমাদের গ্রন্থকারের দোষও আছে। তিনি ২।৪ জন প্রতিভা-শালী লোকের ঠিক estimate করিতে পারেন নাই। রমেশ বাবুর উপন্যাস সম্বন্ধে ইনি বলেন,

"শতবর্ষে Grub Street
হইয়াছে কানা।

আরো একটা অন্যায় কথাই বলিয়াছেন,

"দত্ত সাহেব বলেন ধীরে
লাগাও ওরে গুলি,—
লাগাও গুলি আমায় খালি
M. P. কর ভাই।"

সুরেন্দ্র বাবুকেও কবি ঠিক করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। আমাদের দেশীয় C. S. দেরও estimate ঠিক হয় নাই। দু একজন বেয়াড়া হইলেও মোটের উপর সকলেই ভাল। দু এক-জন খুব ভাল। কবির,—

C. S.,—C. S,—C. S.—করিয়া
তোমরা মর মাথা কুটি,
আমরা বলি C. S. হতেও
আমাদের ভাল রামঘটি।"

ঠিক হয় নাই। C. S দের নম্বর গণিয়া লওয়া যায়। উপরটা সকলের চক্‌চকে না হলেও ভিতরটা খাঁটি। চাকরীর আবরণে থাকে বলিয়া ভিতরকার রংটা হঠাৎ দেখিতে পাওয়া যায় না। C. Sত্ব ফুরাইলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। অনেক C. S. তাই ভাবিয়াই গোড়া থেকে সাবধান হইয়া চলেন।

আমার পুঁথি বাড়িয়া যাইতেছে। সেই জন্য এইখানেই ইতি করিব মনে করিতেছি। তবে দু চারটা কথা অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। আমার একজন বন্ধু এই খিচুড়ী গ্রন্থখানি পড়িয়া বলিয়াছিলেন, লেখক যেন দুর্ব্বাসা মুনি, সর্ব্বদাই যেন গঙ্গাজল ও পৈতা হাতে করিয়া দেশশুদ্ধ লোককে অভিশাপ দিতে প্রস্তুত। উপর উপর পড়িলে প্রথমতঃ কতকটা এইরূপই বোধ হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। এক হিসাবে কবি দুর্ব্বাসা মুনি হইতে পারেন। পৌরাণিক দুর্ব্বাসা মুনি বিনা প্রয়োজনে লোকসমাজে দেখা দেন নাই। কেবল যেখানে প্রয়োজন, সেখানে যেন ভগবৎ-প্রেরিত হইয়া তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। খিচুড়ী গ্রন্থকারও যেখানে উপযুক্ত পাত্র পাইয়াছেন, সেইখানেই দুর্ব্বাসার ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই এক জায়গায় দেখাইয়াছি, কবি একস্থানে নিজেই "শকুন্তলার ত্রুটিধরা দুর্ব্বাসার" আবির্ভাব প্রার্থনা করিয়াছেন। পৌরাণিকমুনির আশীর্ব্বাদ ও উপদেশের কথা শিষ্যমণ্ডলীর বাহিরে বড় একটা শোনা যায় না। কিন্তু আমাদের গ্রন্থকার কবিজনোচিত ভাষায় কোন লেখককে প্রাণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন এবং বিজ্ঞজনোচিত উপদেশও দিয়াছেন। একজন নবীন কবিকে আমাদের কবি বলিতেছেন,—

কল্যাণবর — কবি

আশীষে কল্যাণ ছানিয়া

মস্তকে তোমার এই দীন কবি

যতনে দিতেছে ঢালিয়া।

* * * *

ধন্যা বঙ্গ করিয়া অঙ্গ

জননী অঙ্ক যাচিয়া,

শিশুর সমান বিপুল হরষে

উঠ উঠ কবি নাচিয়া।

সঙ্কুচিত হ'য়ে! থাকুক দর্প

বিনয় হউক ফুল্ল,

কবি হে করহে মিনতি আমার

হৃদয় শিশুর তুল্য।

ব্রাহ্মণ-কবির এই সুমিষ্ট কবিতাময় আশীর্ব্বাদ প্রত্যেক নবীন-কবি ও সুলেখকের মস্তকে বর্ষিত হউক।

হিন্দু নাটকের প্রাচীনত্ব।

চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ইউরোপের সভ্যজাতিগণের মধ্যে নাটকীয় সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই, এইরূপ নির্দ্দেশ করিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ইহারও সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে পূর্ণ মাত্রায় নাটকের প্রচার ছিল।

মনুষ্যসমাজে নাটকের সৃষ্টি অত্যন্ত স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। মানবজাতির মধ্যে অনুকরণ প্রবৃত্তি অতিশয় বলবতী।

বালকবালিকাদিগের মধ্যে এই অনুকরণ করিবার শক্তি সম্যক্‌রূপে পরিলক্ষিত হয়। বালকেরা প্রায়ই পরিণতবয়স্কদিগের আচার ব্যবহারাদি অনুকরণ করিয়া থাকে। তাহারা কখন রাজা, কখন বিচারক, কখন পিতা, কখন অধ্যাপক প্রভৃতির বেশ ধারণ করিয়া সবিশেষ কৃতকার্য্যতার সহিত তাঁহাদের অনুষ্ঠানাবলীর অনুকরণ করিয়া থাকে। বালিকাদিগের প্রায় প্রত্যেক ক্রীড়ার সহিত সংসারের গুরুতর ব্যাপার সমূহের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ষষ্ঠবর্ষদেশীয়া বালিকা পুত্রীকৃত মৃৎপুত্তলের বিবাহ সম্পাদন কার্য্যে কতই বিব্রত; তাহার নিমন্ত্রণের ঘটাই বা দেখে কে। মানবজাতির এই অন্তর্নিহিত অনুকরণী প্রবৃত্তি, অনন্ত ঘটনাপূর্ণ মানবজীবন এবং অনন্তলীলাময়ী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া ক্রমে ব্যাপ্তি এবং উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, এবং ইহাই কালক্রমে নানারূপান্তর পরিগ্রহপূর্ব্বক চক্ষু ও কর্ণের যুগপৎ প্রীতিপ্রদ, অত্যুৎকৃষ্ট আমোদ-প্রদান-সমর্থ নাটকাভিনয় ক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছে, এই অনুমান করা কোন ক্রমেই যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। কেবল আর্য্যজাতির মধ্যেই নাটকের বহুল প্রচার দেখা যায়। তন্মধ্যে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও গ্রীসে স্বাধীনভাবে নাটকের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। প্রাচীন রোম হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ইংলণ্ড, জর্ম্মনি প্রভৃতি সমগ্র ইয়োরোপ গ্রীসের নিকট নাটকাভিনয় শিক্ষা করিয়াছে। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি জাতিকে নাটকাভিনয় প্রথা শিক্ষা দিয়াছে। প্রাচীন পারসীকদিগের মধ্যে নাটকের প্রচার ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সেমিটিক জাতির মধ্যেও নাটক নাই। আরব এবং হিব্রুজাতিরা এক সময়ে সভ্যতার অত্যুন্নত সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার নাটকাভিনয়ের উল্লেখ নাই।

হিরোডোটস প্রাচীন মিশরবাসিদিগের সভ্যতার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন, এবং তাহাদের আচার, নীতি এবং সামাজিক অবস্থাদির অনেক সূক্ষ্ম বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার নাটকের অভিনয় হইত, এরূপ কোন আভাষ দেন নাই। পক্ষান্তরে চীনজাতির প্রাচীন সভ্যতার পরিচায়ক অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির সহিত তাহাদের উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় প্রথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এমন কি, কোন কোন অনুকরণপ্রিয় অসভ্যজাতিদিগের মধ্যেও, এক প্রকার সামান্য রকম অসভ্যোচিত যাত্রাভিনয়ের ন্যায় নাটকাভিনয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কি নিমিত্ত মনুষ্যের স্বাভাবিক অনুকরণী প্রবৃত্তি ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া কেবল কয়েকটি জাতির মধ্যে নাটকের আকার ধারণ করিয়াছে, এবং কি নিমিত্তই বা অবশিষ্ট দেশগুলিতে নাটকের উৎপত্তি হয় নাই, তাহা নিরূপণ করা অতি কঠিন ব্যাপার। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যে জাতির মধ্যে প্রাচীন কালে নাটকাভিনয় প্রথা বর্ত্তমান ছিল, তাহারা সভ্যজাতিবৃন্দের শীর্ষ স্থানীয়, এবং জাতি সাধারণের অবশ্য পূজনীয়।

যতদূর অনুমান দ্বারা স্থির করিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয়, নৃত্য গীত হইতেই নাটকের প্রথমোৎপত্তি হইয়াছে। সংস্কৃতে 'নাটক' শব্দটী, 'নৃত্' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'নৃত্য' এবং 'নাট্য', 'নর্ত্তক' এবং 'নট' উভয় একই পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। প্রথমতঃ নৃত্যের সহিত আনুষঙ্গিক অঙ্গসঞ্চালনাদি এবং সঙ্গীতের সমাবেশ; পরে হস্তাদি সঞ্চালন এবং বহুবিধ মুখভঙ্গির সহিত স্বাভাবিক ভাষায় কোন পৌরাণিক ইতিবৃত্তের বর্ণনা; তৎপরে যাত্রাদির ন্যায় কথোপকথন এবং সঙ্গীতের সংমিশ্রণ এবং সর্ব্বশেষে

প্রকৃত নাটকের সৃষ্টি; এইরূপ ক্রমবিস্তারেই নাটকের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে নাটকের কয়েকটী বিভিন্ন স্তর স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। আমাদের বঙ্গীয় নাটকের উৎপত্তি একটু পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই, সাধারণতঃ নাটকের উৎপত্তি বুঝিতে পারা যাইবে। বাঙ্গালা নাটকের প্রথম অবস্থা, রামায়ণ কিম্বা মহাভারত অথবা অন্যান্য ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ; ইহাকে সাধারণতঃ "কথা" বলে। "কথক" ঠাকুর রামায়ণাদির অংশ বিশেষ সুর করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে শ্রবণ করাইয়া থাকেন। তিনি রামের কথা, রাবণের কথা, অথবা হনুমান্ প্রভৃতির কথা, শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জনার্থ বিভিন্ন ভাষায় বিবিধ সুরে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি সহকারে ব্যক্ত করেন। এই স্থানেই আমরা নাটকাভিনয়ের অঙ্কুর দেখিতে পাই। দ্বিতীয় স্তর, আমাদের যাত্রাভিনয়। ইহাতে নাটকের প্রধান প্রধান উপকরণ কথোপকথন, সঙ্গীত প্রভৃতি প্রায় সমুদায়ই পরিলক্ষিত হয়, কেবল অভিনয় ক্রিয়া, কবিত্ব প্রভৃতি কিয়ৎ পরিমাণে অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে, সম্যক্ পরিস্ফুট হইতে পারে না। ইহারই অব্যবহিত পরে, পূর্ণ নাটকের সৃষ্টি; উৎকৃষ্ট সঙ্গীত, উৎকৃষ্ট চিত্র এবং উৎকৃষ্ট কবিত্বের একত্র সমাবেশ; বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের যুগপৎ পরম পরিতৃপ্তি।

জাতীয় সভ্যতার সহিত নাটকের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্ক দেখা যায়। জাতীয় সমৃদ্ধির উন্নত অবস্থাতেই নাটকের সৃষ্টি এবং পুষ্টি হইয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যায়, প্রত্যেক সুসভ্যজাতির মধ্যে এমন এক সময় আসে. যে সময়ে নাটকের স্বাভাবিক সৃষ্টি হইয়া থাকে। নানা প্রাকার ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া এবং উন্নতির চেষ্টার সময়ে নাটক এবং নাটকাভিনয় প্রথার সৃষ্টি হয়। দুই একটী সভ্যজাতির ইতিহাস পাঠ করিলে এই কথাটী স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

ইংলণ্ডের পরম সৌভাগ্যবতী রাণী এলিজাবেথের রাজত্ব কালে ইংরেজ জাতির নাটকের সৃষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধি হয়। এই সময় ইংরেজ জাতি উন্নতির চরমসীমা লাভ করিয়াছিল। এই সময়ে তাহাদিগের শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তিগুলির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল এবং তাহারা উদ্যমশীলতা এবং কর্ম্মদক্ষতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। রাজ্যের চতুর্দ্দিকে সমৃদ্ধি, সুখ এবং শান্তি বিরাজ করিতেছিল। ইংরাজেরা তখন ধর্ম্মবলে বলীয়ান্; নূতন প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছিল। স্প্যানিস্ আর্ম্মাডার (Spanish Armada) পরাজয়ে ইংরাজের বাহুবল অতুলনীয় বলিয়া প্রমাণিত হইল। কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধির প্রতিদিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। লোকের কর্ম্মদক্ষতা, কর্ম্ম করিবার বাসনার সহিত চতুর্গুণ উদ্দীপিত হইল। কেহ আমেরিকায় নূতন দেশ আবিষ্কার করিতে চলিল; কেহ ভারতবর্ষে আসিবার নূতন পথ অন্বেষণ করিতে চলিল; কেহ বা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করিতে গিয়া সহস্রপ্রাণিপূর্ণ অর্ণবযান সহিত অতল জলে ডুবিয়া গেল। এইরূপ নানা প্রকার "ঘাত প্রতিঘাতের" মধ্যে ইংরাজের জাতীয় নাটকের সৃষ্টি হইল। জাতীয় প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি ক্রমে নাটকীয় হইয়া পড়িল। প্রথমে অসম্পূর্ণ নাটক "Mysteries", "Moralities", "Interludes", প্রভৃতি নানাবিধ নামে অভিহিত হইয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। পরে নাটকগুরু সেক্সপীয়ার এবং তাঁহার সমসাময়িক নাটককারগণ কর্ত্তৃক নাটকের পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তি হইল। প্রাচীন গ্রীসদেশেও নাটকসৃষ্টির ইতিহাস এইরূপ। খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসবাসিগণ পারস্যাধিপতি জোরাক্সিসের ৫০ লক্ষ সেনাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল

তাহাদের বাহুবল তখন অসীম। এই সময়ের কিঞ্চিৎ পরে পেরিক্লিস্ এথেন্সের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ করেন। তাঁহার শাসনগুণে এথেন্সবাসিদিগের সুখের সীমা ছিল না। এই সময়ে তাহারা শিল্পবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, ভাস্করবিদ্যা প্রভৃতি নানা প্রকার সুকুমার শিল্পে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তখন তাহাদের অদ্ভুত উদ্যমশালিতা ছিল। এই রূপ সময়েই এথেন্সে নাটকের সৃষ্টি হয়। প্রথমে ধর্ম্মমন্দিরে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া সঙ্গীত যাত্রাদি হইত। পরে এস্কিলিস্, সফোক্লিস্, ইউরিপাইডিস্,-এরিষ্টফেনীস্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধনামা নাটকরচয়িতৃগণ জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহারা অত্যুৎকৃষ্ট দৃশ্যকাব্যাবলী রচনা করিয়া রাজকোষের ব্যয়ে অসংখ্য শ্রোতৃমণ্ডল সমক্ষে অভিনয় প্রদর্শন করাইতেন; এবং আপামর সর্ব্ব সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে সমক্ষ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থনিচয় অদ্যাপি তাঁহা-দিগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

এইরূপে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, নাটক সভ্যতার একটি অঙ্গ। যে দেশ প্রাচীন কালে নাটকীয় সাহিত্যে উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সে দেশ যে সেই সময়ে সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে শত শত প্রমাণ আছে; প্রাচীন ভারতে নাটকীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ, অন্যতম একটি প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

বর্ত্তমান কালে প্রাচীন সংস্কৃত নাটকাবলীর অনুশীলনে আমা-দের অনেক উপকার দর্শিতে পারে। ইহাদের অনেকগুলি, সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন, প্রকৃত কবিত্বের খনি। কালিদাস ও ভবভূতির নাটকগুলি কিরূপ অলৌকিক কবিত্বরসে

পরিপূর্ণ, কিরূপ অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক, তাহা সংস্কৃত সাহিত্যজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন। সংস্কৃত নাটকাবলী প্রকৃত কাব্যরসজ্ঞের চিত্তবিনোদন এবং উপদেশ প্রদানে সম্পূর্ণ সমর্থ। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন নাটকের আলোচনায় আমাদের আর একটী গুরুতর লাভ আছে। আমাদের প্রাচীন কালের কোন প্রকৃত ইতিহাস নাই। প্রাচীন হিন্দু সমাজের অবস্থা প্রকৃতরূপে অবগত হওয়া বড়ই দুরূহ ব্যাপার। আমাদের প্রাচীন নাটক-গুলি অনেক পরিমাণে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের স্থান পূরণ করে। ইতিহাস শুদ্ধ ঘটনাবলীর শৃঙ্খল নহে; অথবা রাজবৃন্দের জীবনীত্ত নহে। এলিজাবেথ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন; তাঁহার পিতার নাম ৮ম হেন্‌রী, তাঁহার পিতামহের নাম ৭ম হেন্‌রী; দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ খ্রীঃ পূঃ ২০২ অব্দে হইয়াছিল; এইরূপ কয়েকটি বিবরণ অবগত হইলেই ইতিহাস জানা হইল না। জাতি, জাতীয়তার সংগঠন, জাতির উন্নতি, জাতির সমৃদ্ধির বিবরণ এবং জাতীয়ত্বের ক্রমবিকাশ প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় লইয়াই প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হওয়া উচিত। হিন্দুজাতির এই সকল বিবরণ জানিতে হইলে তাহাদের প্রাচীন কালের নাটকীয় সাহিত্য অনুসন্ধান করা উচিত। প্রাচীন হিন্দুজাতির আচার ব্যবহার, রীতি নীতি রাজনৈতিক অবস্থা, সমাজের অবস্থা, প্রভৃতি সমস্তই এই নাটকাবলীতে বর্ণিত আছে। নাটকে কল্পিত চরিত্রের সমাবেশ হইলেও, এমন কোন নাটক হইতে পারে না, যাহাতে দেশের সমসাময়িক ঘটনাবলী অথবা সামাজিক অবস্থার ছায়া প্রতিফলিত হয় না।

এক্ষণে আমরা হিন্দু নাটকের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি প্রমাণ প্রয়োগ করিব।

আমাদের দেশের কতকগুলি প্রথা এত প্রাচীন যে, তাহাদের প্রথম উৎপত্তি ঠিক কোন সময়ে হইয়াছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা সম্পূর্ণ সুকঠিন। অনেক সময়ে এই প্রথাগুলি দৈবসম্ভব বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। এবং কখন কখন এতৎসম্বন্ধীয় অনেক পৌরাণিক উপন্যাসও পাওয়া যায়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। মনে করুন, আমাদের দেশে জাতিভেদ প্রথা কত প্রাচীন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এই প্রথা ঠিক কোন্ সময়ে কত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ করা সম্পূর্ণ সুকঠিন। এতৎসম্বন্ধে প্রচলিত উপন্যাসটি বড়ই চমৎকার বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্মা যে সময়ে প্রথম মনুষ্য সৃষ্টি করেন, সেই সময়ে তিনিই জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইলেন; বাহু হইতে ক্ষত্রিয় হইলেন; উরু হইতে বৈশ্য হইলেন; এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিলেন (১)। এই উপন্যাসে জাতিভেদ প্রথা একেবারে সৃষ্টির সমসাময়িক হইল, এবং ইহার প্রাচীনত্বের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল। এই উপন্যাসের সত্যাসত্য প্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই; কিন্তু ইহাতে অন্ততঃ একটি সত্য পাওয়া যাইতেছে। জাতিভেদ প্রথা যে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা এই উপন্যাস দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে উপলব্ধি হয়। এইরূপ, অধিকাংশ অতি প্রাচীন প্রথা সম্বন্ধে, প্রাচীনতার পরিচায়ক অনেক উপন্যাস পাওয়া যায়।

---

(১) বভুবুর্ব্রহ্মণো বক্ত্রাদন্যা ব্রাহ্মণজাতয়ঃ।
ব্রহ্মণো বাহুদেশাচ্চ জাতাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ ॥
উরুদেশাচ্চ বৈশ্যাশ্চ পাদতঃ শূদ্রজাতয়ঃ।

নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধেও এইরূপ উপন্যাস প্রচলিত আছে। প্রথম নাটক দেবতাদিগের মনোরঞ্জনার্থ স্বর্গে অভিনীত হয়। এই নাটকের প্রথম প্রবর্ত্তক ভরতনামা মুনি। স্বয়ং বাগ্দেবী সরস্বতী নাটকরচয়িত্রী ছিলেন। আর অভিনয় করিতেন, অপ্সরোগণ এবং গন্ধর্ব্বগণ। কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে এইরূপ একটি গল্প আছে। বিক্রমোর্ব্বশীর তৃতীয়াঙ্কের প্রারম্ভে ভরতমুনির শিষ্যদ্বয়ের একটি কথোপকথন আছে। তাহাতে এক শিষ্য অপরকে স্বর্গে গুরুপ্রবর্ত্তিত নাটকাভিনয়ের বৃত্তান্ত কহিতেছেন। প্রথমোক্ত বলিতে লাগিলেন, তাহাদের গুরুদেব শ্রীমতী সরস্বতী দেবী প্রণীত "লক্ষ্মীস্বয়ম্বর" নামক নাটক অভিনয় করাইতেছিলেন। অভিনয় হইতেছিল, দেবগণের সমক্ষে; আর অভিনয় করিতেছিলেন, প্রথিতনাম্নী উর্ব্বশী, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরোগণ। উর্ব্বশী, লক্ষ্মীচরিত্র এবং মেনকা বারুণীচরিত্র অভিনয় করিতেছিলেন। বারুণী (মেনকা) লক্ষ্মীকে (উর্ব্বশীকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, সমবেত সকেশব লোকপালগণের মধ্যে কে তোমার মনোমত বলিয়া বোধ হয়। উর্ব্বশীর বলিতে হইবে "পুরুষোত্তম"। উর্ব্বশী ইতিপূর্ব্বে প্রাণদাতা পুরুরবার ভুবনমোহনরূপে উন্মাদিনী; পুরুরবার নাম তাহার জপমালা। উর্ব্বশী নাটকাভিনয় ভুলিয়া গেল; নিজের মনের কথা বলিয়া ফেলিল, নামের আদ্যক্ষরদ্বয়ের সাদৃশ্য দেখিয়া বলিল "পুরুরবসি"। স্বপ্রবর্ত্তিতশাস্ত্রের এইরূপ অবমাননা দেখিয়া উপাধ্যায় উর্ব্বশীকে অভিশাপ দিলেন, "তোর দিব্য জ্ঞান নষ্ট হইবে।" উর্ব্বশীর শাপে বর হইল। দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে আশ্বাস দিয়া মর্ত্ত্যলোকে পুরুরবার মহিষী করিয়া পাঠাইলেন। বোধ হয়, নাটকশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই কালিদাস বিক্রমোর্ব্বশীতে এই প্রসঙ্গের

অবতারণা করিয়াছেন, এবং এই উপন্যাসটি নাটকের প্রাচীনতারও সম্পূর্ণ পরিচায়ক।

হিন্দু নাটকের প্রাচীনতা প্রমাণ করিবার আরো একটি প্রকৃষ্ট উপায় আছে। কোন একখানি নাটক মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে সেই নাটক হইতেই তাহার প্রাচীনতার পরিচায়ক অনেকগুলি আভ্যন্তরীণ প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা(১) "মৃচ্ছকটিক" নামক প্রাচীন নাটক হইতে কয়েকটি প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছি। সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধারের মুখে নাটককারদিগের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় থাকে; অন্ততঃ তাহাতে সমাসবদ্ধ বিশেষণ-সংযুক্ত গ্রন্থকারের নামটি জানা যায়। মৃচ্ছকটিকে নাটকরচয়িতার কিছু বিস্তৃত বিবরণ আছে। তিনি গজেন্দ্রগতি, চকোরনেত্র, চন্দ্রানন, রূপবান, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ এবং অপরিমিত বলশালী ছিলেন। তাঁর নাম শূদ্রক ছিল। তিনি ঋক্ এবং সামবেদ, গণিতশাস্ত্রে এবং নৃত্যগীতাদি ললিতকলা এবং হস্তিশিক্ষা প্রভৃতিশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। তিনি স্বীয়পুত্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া, অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক দশদিনাধিক শতবর্ষ বয়সে অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধ-ব্যসনী, অপ্রমত্ত, বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ, তপোধন এবং বাহুযুদ্ধ-নিপুণ ছিলেন। এবং তিনি স্বয়ং রাজা ছিলেন। কিন্তু এতখানি বর্ণনার মধ্যে, তিনি কোন্ দেশের রাজা ছিলেন, তাহার নামগন্ধটি পর্য্যন্ত নাই। রাজাশূদ্রক কোন্ দেশের রাজা ছিলেন, কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, প্রভৃতি তত্ত্ব কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারিলেই তদীয় গ্রন্থের সময় নিরুপণ করা যাইত। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে কিছুই জানিবার উপায় নাই। কেবল

(১) প্রাচলিত সংস্কৃত নাটকাবলীর মধ্যে মৃচ্ছকটিক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে শূদ্রকনামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে অন্ধ্রবংশীয় মগধরাজগণের প্রথম রাজা বলিয়া দির্দ্দেশ করেন এবং কেহ কেহ তাঁহাকে বিক্রমাদিত্যের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক অবন্তীয় রাজা বলিয়া দির্দ্দেশ করেন। এবং এই রূপে তিনি খ্রীষ্টজন্মের দুই অথবা তিন শতাব্দী পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল। কিন্তু এই শূদ্রকরাজা এবং মৃচ্ছকটিকের নাটককার প্রকৃত পক্ষে একই ব্যাক্তি ছিলেন বলিয়া কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই সকল আনুমানিক কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা প্রস্তাবনোক্ত বিবরণে একটি অপেক্ষাকৃত সারবত্তর কথা পাই। তিনি "অগ্নি প্রবেশ দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন" এই কথাটি গ্রন্থের অতিশয় প্রাচীনত্বের একটি প্রমাণ। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে এইরূপে "অগ্নি প্রবেশ দ্বারা আত্মহত্যা করা মহাপাপ।" কিন্তু অতি প্রাচীন কালে মনুসংহিতাদি সংগৃহীত হইবার সময়ে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। রামায়ণে শরভঙ্গ নামক ঋষির এইরূপ অগ্নি প্রবেশের কথা আছে। সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের আদিম অবস্থায় এবং কলিযুগ-প্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রাদি সংগৃহীত হইবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীতে, এই নাটক লিখিত হইয়াছিল। এইজন্য গ্রন্থকারের অগ্নি প্রবেশ দ্বারা মৃত্যু সমাজে দূষণীয় বলিয়া পরিগৃহীত হয় নাই; এবং এই জন্যই প্রস্তাবনালেখক (১) অসঙ্কুচিতচিত্তে গ্রন্থ মধ্যে এই কথার সন্নিবশে করিয়াছেন। নিম্নলিখিত প্রমাণদ্বয় এই মতের সম্পূর্ণ পরিপোষক।

(১) সাধারণতঃ অনেকের বিশ্বাস নাটককার স্বয়ংই প্রস্তাবনায়, সূত্রধারের মুখে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।– এইরূপ ধারণা সত্য হইলে মৃচ্ছ-

প্রায় প্রত্যেক নাটকে শকার অথবা রাজশ্যাল বলিয়া একটি চরিত্রের সমাবেশ থাকে। শকার অনেকটা ইংরাজি clown এর (ভাঁড়ের) সদৃশ। শকার সাধারণতঃ রাজরক্ষিত বলিয়া দুষ্কর্ম্মান্বিত, মূর্খ, ভীরু, এবং দুর্ব্বলের উৎপীড়ক। তাহার কথা হতোপম, পুনরুক্ত, এবং লোক-ন্যায়-বিরুদ্ধ। মৃচ্ছকটিকের শকার-সংস্থানকও এইরূপ দুশ্চরিত্র ও দুষ্ক্রিয়ারত। স্বানুরূপ সঙ্গি-সমভিব্যাহারে বসন্তসেনার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া বসন্তসেনাকে সম্বোধন করিয়া শকার মহাশয় রামায়ণ এবং মহাভারতের শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, এবং নিজের অদ্ভুত এবং অগাধ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। কতকগুলি শ্লোকে, রাবণবশীভূতা কুন্তী, হনুমানের সুভদ্রাহরণ, রামভয়ে দ্রৌপদীর পলায়ন, চাণক্য কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ প্রভৃতি অদ্ভুত ইতিহাসজ্ঞাতার পরিচয় আছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, সংস্থানক শুদ্ধ রামায়ণ, এবং মহাভারত হইতে কেন উদাহরণ তুলিল, এবং পুরাণাদি হইতে কেন একটিও উদাহরণ গ্রহণ করিল না। গ্রন্থকার অবশ্য মহামহোপাধ্যায় এবং অশেষ-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি রামায়ণ, মহাভারত, এমন কি চাণক্যের কথা পর্য্যন্ত তুলিলেন, কিন্তু কেন যে তিনি পুরাণোক্ত ব্যক্তিগণের নাম একেবারেই করেন নাই, তাহার সন্তোষজনক কোন কারণ দেখা যায় না। এই জন্য ইহাই সম্ভবপর বলিয়া

কটিকের প্রস্তাবনা বড়ই কৌতুকাবহ বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থকার স্বয়ং কি করিয়া লিখিলেন, তিনি ১০০ বৎসর ১০ দিন বাঁচিয়া মরিয়াছিলেন। একজন টীকাকার বলেন, তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন ; স্বকীয় বিদ্যা প্রভাবে তিনি ভবিষ্যৎকে অতীত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই টীকাকারের প্রতি যথা-যোগ্য সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক সকলেই সহজে অনুমান করিতে পারেন যে, প্রায় প্রত্যেক-নাটকেরই প্রস্তাবনা দ্বিতীয় ব্যক্তির লিখিত।

বোধ হয় যে, পুরাণাদির পূর্ব্বেই এই নাটক লিখিত হইয়াছিল; এবং তখন পর্য্যন্ত পুরাণসমূহের একেবারেই সংগ্রহ হয় নাই, অথবা হইয়া থাকিলেও তাহাদের বহুল প্রচার হয় নাই। চাণক্যের নামোল্লেখ থাকাতে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের পর নাটক প্রণীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। চন্দ্রগুপ্ত খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে, অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে, এই নাটক প্রণীত হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এই নাটকের প্রচীনত্বের আর একটি দৃঢ় প্রমাণ আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ভারতের অনেক উপকার করিয়াছে, তাহা বোধ হয় বিদ্বজ্জন মাত্রই স্বীকার করিবেন। বৌদ্ধধর্ম্মের তেজঃ-প্রভাবে তাৎকালিক হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কার সকল ভস্মীভূত হইয়াছিল এবং হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছিল। ইহারই অভ্যুদয়ালোকে অন্ধতমসাচ্ছন্ন প্রাচীন ভারতেতিহাস স্থানে স্থানে উদ্ভাসিত হইয়াছে। এই ধর্ম্ম দিগন্তব্যাপিত হইয়াছিল বলিয়া, সময়ে সময়ে বৈদেশিক পরিব্রাজকগণ ভারতে আগমন করিয়া স্ব স্ব সময়ের প্রকৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ করিলে ভারতবর্ষের অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য এবং নাটকাবলীর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত গ্রন্থ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অনেক অভিনব ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা যাইতে পারে। ললিতবিস্তর প্রভৃতি বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিয়া, অন্যান্য গ্রন্থোক্ত বিবরণাবলী পাঠ করিলে, অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সময় নির্দ্দেশ করা যায় এবং জাতীয় রীতি নীতি এবং

সমাজের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারা যায়। মৃচ্ছকটিকের স্থানে স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসিদিগের বৃত্তান্ত আছে। যেরূপভাবে এই বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, বৌদ্ধধর্ম্মের তখন হীন অবস্থা ছিল না। এবং প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত ইহার কোন বিরোধ ছিল না। বৌদ্ধেরা তখন একটি সবিশেষ পরিচিত এবং ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল। এক্ষণে, বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠে জানা যায়, খ্রীষ্টজন্মের দুই শত অথবা তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের এই রূপ অবস্থা ছিল। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠে; এবং খ্রীষ্ট দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে এই ধর্ম্ম ভারতে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণপ্রভ হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং আমরা অনেক পরিমাণে নিঃসঙ্কুচিতচিত্তে বলিতে পারি যে অন্ততঃ খ্রীষ্ট জন্মের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মৃচ্ছকটিক লিখিত হইয়াছে।

এইরূপ নানাবিধ আভ্যন্তরীণ প্রমাণ প্রয়োগে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে যে, মৃচ্ছকটিক অন্ততঃ খ্রীষ্ট জন্মের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। মৃচ্ছকটিক এক খানি পূর্ণাঙ্গ নাটক। অতি প্রাচীন হইলেও ইহাতে আধুনিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের সমস্ত লক্ষণই বর্ত্তমান আছে। অতি কৌশলে ইহাতে দুইটি বিভিন্ন উপন্যাস সংমিশ্রিত হইয়াছে। অতি কৌশলের সহিত নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইংরাজিতে যাহাকে Plot-interest (১) বলে, তাহাও প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ উচ্চ শ্রেণীর নাটক লিখিত হইবার অনেক পূর্ব্বেই যে নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনু-মাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্মেরও অনেক পূর্ব্বে

(১) উপসংহারৌৎসুক্য।

যে ভারতবর্ষে নাটকের প্রচার ছিল, নিম্নে তদ্বিষয়ে একটি অখণ্ডনীয় প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

ভগবান্ পাণিনির ব্যাকরণে নাটকের প্রাচীনতার পরিচায়ক একটি সূত্র আছে, সে সূত্রটি এই, "পারাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষু নট সূত্রয়োঃ"। এইটি "ঢিনুক্" প্রত্যয়ের বিধায়ক একটি সূত্র। পারাশর্য্য প্রণীত ভিক্ষুসূত্র যাঁহারা অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগকে "পারাশরিণো ভিক্ষবঃ" এবং শিলালিমুনিপ্রণীত নটসূত্র যাঁহারা অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগকে "শৈলালিনোনটাঃ" বলা হয়। এই সূত্র দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পাণিনির পূর্ব্বে শিলালি নামক এক জন মুনি ছিলেন, এবং তিনি নাটক শাস্ত্রের সূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। পাণিনির পূর্ব্বে নাটক প্রথা শুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহা নয়, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নাটক অধ্যয়নীয় শাস্ত্ররূপে বর্ত্তমান ছিল, ইহাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। এক্ষণে পাণিনি কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেই হিন্দু নাটকের অতি প্রাচীনত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইতে পারে। পরম পণ্ডিত অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকর "নির্ব্বাণোঽবাতে" * প্রভৃতি পাণিনি সূত্রের সূক্ষ্ম সমালোচনা দ্বারা অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন যে, পাণিনি বৌদ্ধধর্ম্মাভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। পাণিনির সময় নিরূপণ

---

* পাণিনির এই সূত্রদ্বারা বায়ুশূন্যতা অর্থে নিঃ পূর্ব্বক বা ধাতুর উত্তর "ক্ত" প্রত্যয়ের "ত" স্থানে "ন" হয়। বৌদ্ধদিগের অপবর্গবাচক "নির্ব্বাণ" শব্দ পাণিনির ব্যাকরণে নাই। এমন কি "নির্ব্বাণদীপ" প্রভৃতি স্থানে "নিবে যাওয়া" অর্থে পাণিনি "নির্ব্বাণ" শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কাত্যায়নের বৃত্তিতে এবং পতঞ্জলি ভাষ্যেতেই এই "নিবে যাওয়া" অর্থ পাওয়া যায়। ইহা হইতেই গোল্ডষ্টুকার অনুমান করেন, শাক্যজন্মের পূর্ব্বেই পাণিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

সম্বন্ধে অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকরের এই মত এক্ষণে প্রচলিত মত হইয়াছে। বুদ্ধদেব খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, খ্রীষ্টজন্মের ছয় শত বৎসরেরও অনেক পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নাটক-প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল।

অন্য ঐতিহাসিক প্রমাণাভাবে আমাদিগকে এই কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইতেছে যে, খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দীতে বহুল পরিমাণে নাটকের প্রচার ছিল। ইহা অপেক্ষাও অনেক পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে নাটকের প্রচার ছিল, এরূপ অনুমান করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। মহাভারতে এবং রামায়ণেও নাটকপ্রথা প্রচলনের অনেক কথা পাওয়া যায়।

প্রাচীন পঞ্চাল দেশ।

সেকালে ভারতবর্ষে একরকম Federation of States ছিল। আজকাল যেমন ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ নানা জেলায় বিভক্ত সেকালে তেমনি প্রত্যেক প্রদেশ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সেকালে আজকাল্‌কার মত কোনরূপ প্রদেশ-বিভাগ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে উত্তর ভারতবর্ষ, দক্ষিণ-ভারতবর্ষ, পূর্ব্ব-প্রদেশ, পশ্চিম-প্রদেশ এইরূপ একটা বিভাগ ছিল বলিয়া বোঝা যায়। রাজারা স্ব স্ব রাজ্যে স্বাধীন ছিলেন এবং তাঁহাদের রাজ্য এক একটি বিস্তৃত জনপদ ছিল। তাহাতে একটি বা দুইটি বা ততোঽধিক রাজধানী থাকিত। রাজারা স্বাধীন এবং পরস্পর প্রীতিপরায়ণ ছিলেন বটে, কিন্তু

কখন কখন তাঁহাদের মধ্যে যুদ্ধ বিবাদাদি সংঘটিত হইত। কখন কখন রাজারা অশ্বমেধাদি যজ্ঞ উপলক্ষ করিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন। তখন যিনি প্রবল তিনি অনেক রাজা জয় করিয়া নিজের রাজ্যে বহুবিধ লুণ্ঠিত দ্রব্য বা উপঢৌকন আনয়ন করিতেন। কিন্তু বিজিত রাজ্য প্রায় তেমনই থাকিত। কখনো কোন পরাজিত রাজা বিজেতাকে মাঝে মাঝে উপঢৌকন পাঠাইত অথবা কিছু দিনের জন্য কিয়ৎপরিমাণে করপ্রদান করিত। রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় এ বিষয়ে একটি সুন্দর উদাহরণ আছে।

গৃহীত প্রতিমুক্তস্য স ধর্ম্মবিজয়ী নৃপঃ।
শ্রিয়ং মহেন্দ্রনাথস্য জহার নতু মেদিনীম্॥

রঘু কলিঙ্গরাজকে পরাভূত করিয়া তাঁহাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। এই সকল দিগ্বিজয় কাহিনী রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণাদিতে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল কাহিনী পড়িয়া সেকালের সভ্যতার অবস্থা এবং জাতীয় ইতিহাস উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়। আমাদের এই বিংশতি শতাব্দীর সভ্যতা অপেক্ষা তখনকার সভ্যতা কোন কোন বিষয়ে উন্নত ছিল। প্রীতি এবং ঐক্য তখনকার সভ্যতার মূল মন্ত্র ছিল। যখন কোন রাজাকে একজন প্রবল দুর্দ্দান্ত রাজা আক্রমণ করিয়া উৎপীড়ন করিত তখন তিনি কোন মধ্যবর্ত্তী প্রতাপশালী নরপতির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। এই মধ্যমভূপালই মীমাংসা করিয়া দিয়া পুনর্ব্বার রাজাদের মধ্যে পূর্ব্বপ্রীতি ও স্বাধীনতা স্থাপন করিতেন। কালিদাস রঘুবংশে সমুদ্র বর্ণনাকালে একটী সুন্দর উপমাতে সে কালের এই অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন।

পক্ষচ্ছিদা গোত্রভিদাত্তগন্ধাঃ
শরণ্যমেনং শতশোমহীধ্রাঃ ।
নৃপা ইবোপপ্লবিনঃ পরেভ্যো
ধর্ম্মোত্তরং মধ্যমমাশ্রয়ন্তে ॥

যিনি প্রবল, তিনি মধ্যে মধ্যে নিজ বিক্রম পরাক্রমের পরিচয় দিতেন এবং কখন কখন কিছু পার্থিবসুখ অধিক পরিমাণে ভোগ করিতেন, এইমাত্র ; রাজ্য জয় করিয়া কোন দেশকে চিরকাল করপ্রদায়ী করিয়া রাখিতেন না। বর্ত্তমান যুরোপের সাম্রাজ্য গুলি যেমন পরস্পর কখনও কাহারও প্রতি আক্রমণ করে না এবং পরস্পরের স্বাধীনতা স্বীকার করে সেকালে ভারতবর্ষেও কতকটা এইরূপ ভাব ছিল। দিগ্বিজয়ের সময় কখন কখন কেবল যুদ্ধমাত্র হইত তার পরে বিজয়ী রাজা আপনার রাজ্যে ফিরিয়া যাইতেন। পারসীক ও হূণদিগকে সংগ্রামে জয় করিয়া রঘু বোধ হয় বিশেষ সুবিধা ভোগ করেন নাই ; তাহারা তাঁহার বড় বেশী পদানত হয় নাই। কদাচিৎ অত্যাচারী রাজাকে দমন করিবার জন্য প্রবল রাজা ভ্রাতা, পুত্র কিংবা অন্য কোন নিকট আত্মীয়কে পাঠাইতেন ; সেই সময়ে বিজয়ী রাজকুমারেরা বিজিত দেশে নূতন রাজ্য সংস্থাপন করিতেন। কিন্তু ইঁহারা কালে স্বাধীন হইয়া নূতন বংশের প্রতিষ্ঠাতা হইতেন। রামচন্দ্র মথুরাবাসী লবণাসুরকে দমন করিতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে পাঠাইয়া ছিলেন এবং শত্রুঘ্ন লবণকে পরাভূত করিয়া মথুরায় নূতন পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং বহুকাল তথায় রাজত্ব করেন। তাঁহার বংশাবলীও বহুকাল মথুরা জনপদের অধিপতি ছিলেন। এইরূপ নানা উদাহরণ হইতে দেখান যাইতে পারে সেকালে ভারতবর্ষ অনেকগুলি ছোট বড় বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং সাধারণতঃ

পরস্পরের সহিত পরস্পরের অতিশয় প্রীতি ও ঐক্য ছিল। যেমন একটি বৃহৎ ভদ্রজনপূর্ণ গ্রামে নানা লোকের বাস থাকে এবং তাহারা পরস্পরের অধীন না হইয়া সুখে ও প্রীতিতে একত্র বাস করে, প্রাচীন রাজারাও সেই রূপ ভারতবর্ষ মহাদেশে মহাসুখে বাস করিতেন। কখন কখন কোন রাজা বহু বলশালী হইয়া সম্রাট্ পদবী লাভ করিতেন এবং কিয়ৎপরিমাণে অন্যান্য রাজন্য-বর্গের উপর আধিপত্য করিতেন।

এই সকল প্রাচীন জনপদের এবং প্রাচীনকালের অধিবাসী-দিগের ইতিহাস জানিবার জন্য সকলেরই একটা স্বাভাবিক ঔৎসুক্য হয়। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থে এই ইতিহাস বিচ্ছিন্ন ও বিকৃতভাবে পরিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সকল প্রাচীন গ্রন্থাবলী হইতে প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। বিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিলে এবং অনেক লোকে সাহায্য করিলে এবিষয়ে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা এই মহাপুণ্যময় কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার হইবে। এই প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলন পক্ষে প্রাচীনকালের প্রকৃত ভূগোলবৃত্তান্ত সংগ্রহ একটি প্রধান সহায়——অর্থাৎ কোন্ জনপদ কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহার চতুঃসীমা কি, সে দেশে কোন্ নদী কোন্ পর্ব্বত অবস্থিত, প্রভৃতি বৃত্তান্ত ঠিক জানিতে পারিলে প্রাচীনকালের ইতিহাস সঙ্কলন অনেক সহজসাধ্য হইতে পারে। কোন দেশের যথার্থ প্রাকৃতিক অবস্থা জানিতে পারিলে তদ্দেশবাসীদেরও প্রকৃত অবস্থা অনেক পরিমাণে জানিতে পারা যায়। প্রাচীনকালের ভূগোলবিবরণ এইজন্য প্রাচীন কালের সভ্যতার ইতিহাস জানিবার পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। এই প্রাচীন ভূগোলবৃত্তান্তও রামায়ণ মহাভারতাদি

প্রাচীন গ্রন্থাবলীমধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। বহুলোকের সমবেত চেষ্টায় এবিষয়েও কিছু অগ্রসর হইতে পারা যাইবে। আমরা উদাহরণ-স্বরূপ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে একটি প্রাচীন দেশের যৎকিঞ্চিৎ ভৌগোলিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলাম। প্রাচীন পঞ্চালদেশ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এখানে লিখিত হইল।

মহাভারতোক্ত জনপদসমূহের মধ্যে পঞ্চালদেশ একটি প্রধান রাজ্য। মহাভারতের যিনি প্রধানা নায়িকা সেই দ্রুপদরাজকন্যা পঞ্চালদেশোদ্ভবা এবং পাঞ্চালী নামে সুপ্রসিদ্ধা। পঞ্চালে পঞ্চ-পাণ্ডবের শ্বশুরালয় এবং রাজা দ্রুপদ এবং তাঁহার পুত্রগণ ভারত-যুদ্ধের প্রধান যোদ্ধৃগণের শ্রেণীভুক্ত। কৌরব ও পাণ্ডবগণের অস্ত্রগুরু বীর দ্রোণাচার্য্য এই পঞ্চালদেশের কিয়দংশের অধীশ্বর ছিলেন। পঞ্চালদেশ প্রাচীন কালে একটি বিখ্যাত এবং বিস্তীর্ণ ভূভাগ ছিল, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। মহা-ভারত এবং পুরাণাদির মতে পঞ্চাল শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ :— পঞ্চ + অলং। মহারাজ হর্য্যশ্বের পঞ্চপুত্র ছিল। ইনি পুত্রদিগকে যে দেশশাসনের ভার দিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, আমার এই পাঁচপুত্র রাজ্যরক্ষায় অলম্ (যথেষ্ট)। এইজন্য দেশের নাম হইল পঞ্চাল (১)। কেহ কেহ পঞ্চালশব্দকে পঞ্জাব শব্দের পূর্ব্ব-গামী বলিয়া মনে করেন। রামায়ণ, মহাভরত উপনিষৎ ও পুরাণাদিতে পঞ্চালদেশের বহু উল্লেখ আছে। পাণিনিতেও নানা-দেশের উল্লেখের সঙ্গে পঞ্চালের নামও পাওয়া যায়। তবে

---

(১) হর্য্যশ্বান্মুদ্গল সৃঞ্জয় বৃহদিষু যবীনর কাম্পিল্য সংজ্ঞাঃ।
পঞ্চানামেতেষাং বিষয়াণাং রক্ষায়ালমেতে মৎপুত্রাঃ।
ইতি পিত্রাভিহিতা ইতি পঞ্চালাঃ।
বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ, ১৯ অধ্যায়।

মহাভারতেই পঞ্চালদেশের বিশেষ উল্লেখ আছে। মহাভারত হইতে পঞ্চালদেশের ভৌগোলিক অবস্থিতি নির্ণয় করিবার সুবিধা হয়। পঞ্চালদেশের দুইভাগ ছিল, উত্তর পঞ্চাল ও দক্ষিণ পঞ্চাল। যেরূপে এই দুই বিভাগ হয় তাহার বিবরণ মহাভারতে এই-রূপ আছে ঃ—

পৃষত নামে নরপতি পঞ্চালদেশের রাজা ছিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ পৃষতের পরম সখা। দ্রুপদ, নরপতি পৃষতের পুত্র এবং দ্রোণ ভরদ্বাজের পুত্র। দ্রুপদ এবং দ্রোণের মধ্যেও পরমসখিত্ব ছিল। দ্রুপদ প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া দ্রোণের সহিত একত্র ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। যেখানে পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ হিমালয়পর্ব্বত হইতে ভগবতী ভাগীরথী নির্গত হইয়াছেন মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম সেইখানে অবস্থিত ছিল। ক্রমে রাজা পৃষত ও মহর্ষি ভরদ্বাজের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। দ্রুপদ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন; দ্রোণাচার্য্যও পিতার আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ইহার পর দ্রোণ মহাশয় ভগবান পরশুরামের নিকট অস্ত্রবিদ্যা লাভ করিলেন এবং তাঁহার নিকট অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া একদিন প্রিয়সখা দ্রুপদের নিকট গমন করিলেন। মহারাজ দ্রুপদ তখন ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণের সহিত পূর্ব্ব সখিভাব রাখিতে ইচ্ছুক হইলেন না এবং ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ কটুবাক্য বলিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ রোষে ও ক্ষোভে বিষণ্ণমনে হস্তিনাপুরে চলিয়া গেলেন এবং তথায় নিজবিদ্যাবলে কৌরব ও পাণ্ডব রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষার গুরু নিযুক্ত হইলেন। আচার্য্য দ্রোণের অদ্ভুত শিক্ষাপ্রভাবে রাজকুমারেরা অল্পকাল মধ্যে ধনুর্ব্বেদে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। গুরুদক্ষিণার সময় আচার্য্য শিষ্যগণকে বলিলেন "তোমরা পঞ্চাল-

রাজ দ্রুপদকে রণক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিয়া আনয়ন কর, উহাই তোমাদের গুরুদক্ষিণাস্বরূপ হইবে"। অর্জ্জুনাদি শিষ্যগণ তথাস্ত বলিয়া সত্বর পঞ্চালদেশ আক্রমণ করিলেন। মহাযুদ্ধ হইল। রাজকুমারেরা জয়ী হইয়া রণস্থল হইতে দ্রুপদরাজ ও তাঁহার সচিব উভয়কে গ্রহণ করিয়া আচার্য্য দ্রোণের নিকট উপহার প্রদান করিলেন। দ্রুপদ এক্ষণে দ্রোণাচার্য্যের বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বসখ্য সংস্থাপিত হইল। দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদকে তাঁহার হৃতরাজ্যের অর্দ্ধেক প্রদান করিলেন এবং নিজে অর্দ্ধেক রাখিলেন এবং দ্রুপদকে বলিলেন "এক্ষণে তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণকূলের অধিপতি হইলে এবং আমিও উত্তরকূল শাসনে প্রবৃত্ত হইলাম"। ইহার পর মহাভারতে এইরূপ কথা আছে, "দ্রুপদ বিষণ্নমনে গঙ্গার উপকূলে জনপদসম্পন্ন মাকন্দীনগরী ও কাম্পিল্য-পুরী শাসন করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য এইরূপে দ্রুপদকে পরাভব করিয়া চর্ম্মণ্বতীনদী পর্য্যন্ত পঞ্চালদেশ আপন অধিকারে আনিলেন। দ্রুপদ পরাভূত হইয়া আপনাকে নিতান্ত হীনবল বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং স্বীয় বলবীর্য্যে আচার্য্য দ্রোণকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য নিশ্চয় করিয়া অলৌকিক ব্রহ্মবলে পুত্রলাভ করিবার বাসনায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। এদিকে দ্রোণাচার্য্য অহিচ্ছত্রা নগরীর অধীশ্বর হইয়া রাজ্যশাসন ও প্রজা-পালনে প্রবৃত্ত হইলেন।...এইরূপে অর্জ্জুন জনপদসম্পন্ন অহিচ্ছত্রা-পুরী জয় করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে প্রদান করিয়াছিলেন", (আদি-পর্ব্ব ১৩৮ অধ্যায়)। মহাভারতের এই স্থান হইতে এবং আরো দুএকটি জায়গা হইতে পঞ্চাল প্রদেশের প্রকৃত ভৌগোলিক স্থিতি বুঝিতে পারা যাইবে। ক্রমে তাহা দেখাইতেছি।

এই মহাভারতের আদিপর্ব্ব অবলম্বন করিয়া স্বর্গীয় আনন্দরাম

বড়ুয়া মহোদয় বলেন, "The Kingdom of Panchala in the time of Drupad extended from the banks of the Charmanvati (Chambal) up to Gangadwar on the north. The northern portion from Bhagirathi, called Uttar Panchala or Ahichhatra was conquered by Drona and taken away from him. Its capital was Ahichhatra near the Ramganga river between Bariely and Budaon. The principal towns of the Southern portion of Dakshina Panchala were Kampilya and Makandi on the Ganges," এস্থলে বড়ুয়া মহোদয় একটি নূতন কথা বলিয়াছেন, যে অহিচ্ছত্রা নগরী বেরিলী ও বুদাওনের অন্তর্বর্ত্তী। একথার কি প্রমাণ আছে জানিনা, তবে অহিচ্ছত্রা নগরী বেরিলী হইতে কিছুদূরে ছিল ইহা ঠিক।

অধুনাতন একখানি ভারতবর্ষের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে সহজেই দেখা যাইবে বেরিলীর দক্ষিণ পশ্চিমে বুদাওন এবং বেরিলীর বহু উত্তরে হরিদ্বার বা গঙ্গাদ্বার। বেরিলী বুদাওন ফরক্কাবাদ প্রভৃতি অনেক স্থানই উত্তর পঞ্চালের মধ্যবর্ত্তী ছিল। অগ্রে সমগ্র পঞ্চাল জনপদের সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। পঞ্চাল দেশের উত্তর সীমানা দেখা যাইতেছে, যে স্থান হইতে গঙ্গা হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়াছেন সেই স্থান অর্থাৎ যেখানে ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল। দ্রুপদ প্রত্যহ ভরদ্বাজাশ্রমে যাইতেন। অহিচ্ছত্রা নগরী নিশ্চয়ই ভরদ্বাজাশ্রমের অতি সন্নিকটবর্ত্তী। এইজন্য ইহাই সম্ভব যে অহিচ্ছত্রা নগরী বেরিলীর দক্ষিণে না হইয়া বহু উত্তরে হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী। দ্রোণাচার্য্য পিতার আশ্রমের নিকটবর্ত্তী

বলিয়া অহিচ্ছত্রাপুরী নিজ শাসনাধীন রাখিয়াছিলেন। হরিদ্বার এবং গঙ্গাদ্বার যে একই তাহাও বেশ বুঝা যায়। গঙ্গাদ্বারে কনখল তীর্থ। এই তীর্থ অতি সুবিখ্যাত।

স্নাত্বা কনখলে তীর্থে পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।
তীর্থং কনখলং নাম গঙ্গাদ্বারেঽস্তি পাবনং॥

বর্ত্তমান হরিদ্বারের নিকটেই এই কনখল তীর্থ। ভাগীরথী এই স্থানে নগরাজ হইতে অবতীর্ণা হইয়াছেন বলিয়া, বোধ হয়, এস্থলের নাম গঙ্গাদ্বার। মেঘদূতের ভৌগোলিক বর্ণনার সহিত মিলাইলেও বুঝা যায় এই গঙ্গাদ্বারে কনখল তীর্থ এবং গঙ্গাদ্বার ও হরিদ্বার এক। মেঘের পথে ব্রহ্মাবর্ত্ত পড়িয়াছে। সেখানে কুরুক্ষেত্র এবং সরস্বতী নদী। কুরুক্ষেত্র হইতে মেঘ কনখলে উপস্থিত।

"তস্মাদ্গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণা।
জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপঙ্‌ক্তিম্॥

এই বর্ণনায় বেশ বুঝা যাইতেছে ইহাই গঙ্গাদ্বার এবং বর্ত্তমান হরিদ্বার। এই হরিদ্বারই প্রাচীন পঞ্চালের উত্তরসীমা।

আমরা মহাভারতের বর্ণনায় পাইয়াছি চর্ম্মণ্বতী নদী পঞ্চাল-দেশের এক সীমা। এই চর্ম্মণ্বতী নদী ইতিহাস-বিখ্যাতা এবং এতৎসম্বন্ধে একটি বিখ্যাত পৌরাণিক গল্প আছে। গল্পটি এই; ভরতবংশীয় সঙ্কৃতি-তনয় মহারাজ রন্তিদেব দশপুর নামক জনপদের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় দাতা ও অতিথিসংকারপরায়ণ মহাত্মা রাজা দুর্লভ ছিল। তিনি একদিনে কোটী সুবর্ণমুদ্রারও অধিক দান করিতেন। তিনি কুবেরের ন্যায় ধনশালী ছিলেন। তাঁহার ভবনে দুই লক্ষ পাচক সমাগত অতিথি ব্রাহ্মণকে দিবারাত্র পক্ক ও অপক্ক খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করিত। তাঁহার মণি-কুণ্ডল-

ধারী সূপকারগণ প্রত্যহ একবিংশতিসহস্র বলীবর্দ্দের মাংস পাক করিয়াও অতিথিগণকে পর্য্যাপ্ত মাংসাহার করাইতে পারিত না; এই সকল পশু তাঁহার অগ্নিহোত্র যজ্ঞে বিনষ্ট হইত। প্রত্যহ অসংখ্য পরিমাণে হত এই যজ্ঞীয় পশুদিগের চর্ম্মরসরক্তাদি ক্রমে নদীরূপে প্রবাহিত হওয়াতে চর্ম্মণ্বতী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। (মহাভারত দ্রোণপর্ব্ব ৬০ অধ্যায়।)

এই চর্ম্মণ্বতী নদীর উল্লেখ থাকাতে পঞ্চাল দেশের ভৌগোলিক স্থিতি নির্ণয় করা কিয়ৎপরিমাণে সহজ হইয়াছে। এই চর্ম্মণ্বতী নদী বর্ত্তমান চম্বল (chambal) নদী। মেঘদূতের এই বর্ণনা হইতে ইহা ঠিক বুঝিতে পারা যায়। মেঘদূতে এই চর্ম্মণ্বতী নদী এবং রন্তিদেবের কীর্ত্তির উল্লেখ আছে।

ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়ালম্ভজাং মানয়িষ্যন্।
স্রোতোমূর্ত্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্ত্তিম্॥

মেঘের পথ উজ্জয়িনীতে বক্র হইয়া ক্রমে উত্তরবাহী হইয়াছে। উজ্জয়িনীর উত্তরে গম্ভীরা প্রভৃতি দু'একটি ছোট ছোট নদী এবং দেবগিরি নামে ক্ষুদ্র পর্ব্বত। ইহারই অব্যবহিত পরে মেঘ চর্ম্মণ্বতী নদীতে উপনীত। বর্ত্তমান মানচিত্রে উজ্জয়িনীর কিছু উত্তরেই চম্বল নদী উত্তরবাহিনী হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে চর্ম্মণ্বতী নদী ও চম্বল একই নদী। মেঘদূতের পরবর্ত্তী বর্ণনা হইতেও বেশ বুঝা যায় চর্ম্মণ্বতী ও চম্বল নদী একই। চর্ম্মণ্বতীর পরপারে অর্থাৎ উত্তর পারে দশপুর জনপদ :—

"তামুত্তীর্য্য ব্রজ পরিচিতভ্রূলতাবিভ্রমাণাং।
পাত্রীকুর্ব্বন্ দশপুরবধূনেত্রকৌতূহলানাম্॥"

ইহারই অব্যবহিত উত্তরে ব্রহ্মাবর্ত্ত জনপদ এবং কুরুক্ষেত্র ও সরস্বতী নদী।

"ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদমথচ্ছায়য়া গাহমানঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষত্র প্রধন পিশুনং কৌরবং তন্তজেথাঃ॥"

বর্ত্তমান থানেশ্বরের অনেকটা দক্ষিণে এই চম্বল নদী। তাহার কারণ মধ্যে দশপুর নামে একটি বিস্তৃত জনপদ ছিল। অধুনাতন ভারতবর্ষের মানচিত্রের সহিত মিলাইলে বুঝা যাইবে চর্ম্মণ্বতী নদী ও চম্বল নদী এক। হরিদ্বার হইতে চম্বল নদীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী স্থানে একটি রেখা টানিলে দিল্লী প্রভৃতি স্থান তাহার পশ্চিমে পড়ে। এই রেখাকে পশ্চিম সীমা বলা যাইতে পারে। ঠিক পশ্চিম সীমা পাওয়া দুষ্কর। তবে মানচিত্র দেখিলে বোধ হয় বর্ত্তমান দিল্লী প্রভৃতি স্থান পঞ্চালদেশের পশ্চিম সীমা। আর চর্ম্মণ্বতী নদীও কিয়ৎপরিমাণে পশ্চিম সীমা। গঙ্গার উভয়তীরস্থ ভূভাগই পঞ্চালের অন্তর্গত ছিল।

মহাভারতের আর এক স্থান হইতে পঞ্চালদেশের দক্ষিণ সীমা পাওয়া যায়। চর্ম্মণ্বতী নদীও কিয়ৎপরিমাণে দক্ষিণ সীমা। বিরাটপর্ব্বে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের বিবরণ আছে। এই পর্ব্বের পঞ্চম অধ্যায়ে আছে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা অজ্ঞাতবাসের জন্য কালিন্দী নদীর দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে কখন বা গিরিদুর্গ কখন বনদুর্গে অবস্থান করিয়া, মৃগয়া করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মৎস্যদেশে যাইতেছেন। তাঁহারা দশার্ণদেশের উত্তর এবং পঞ্চালদেশের দক্ষিণ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে দশার্ণদেশ পঞ্চালের একসীমা এবং দক্ষিণসীমা। এই দশার্ণদেশের ভৌগোলিক অবস্থিতি মেঘদূত হইতে জানিতে পারা যায়। মেঘদূতে আছে "শ্যামজম্বূবনান্তাঃ—দশার্ণাঃ" এবং তাহার রাজধানী বিদিশা এবং এই রাজধানী বেত্রবতী নদীর (Bitwa)

তীরে অবস্থিত। নর্ম্মদা নদী এবং এই বিন্ধ্য পর্ব্বতের অব্যবহিত পরেই এই বিদিশা। মানচিত্রে দেখিলে দেখা যাইবে উজ্জয়িনীর পূর্ব্বে এই ভূভাগ। বিদিশা সম্ভবতঃ বর্ত্তমান ভিল্‌সা (Bhilsa) এবং মালবদেশের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। দশার্ণদেশ বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মানচিত্রে দেখিলে বুঝা যাইবে পঞ্চালদেশ অন্ততঃ বর্ত্তমান এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহা পঞ্চালের দক্ষিণসীমা, রাজা দ্রুপদ গঙ্গার উপকূলে জনপদসম্পন্ন মাকন্দী ও কাম্পিল্যনাম্নী দুইটি নগরী শাসন করিতেছিলেন, মহাভারতের এই বর্ণনা হইতেও বুঝা যায় দক্ষিণ পঞ্চালদেশ গঙ্গা হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল।

পঞ্চালের পূর্ব্বসীমার বিবরণ ঠিক পাওয়া যায় না। কিন্তু মানচিত্রে দেখিলে অযোধ্যা বা কোশল জনপদই ইহার পূর্ব্বসীমা বলিয়া বোধ হয়। গঙ্গার যে স্থান পঞ্চালের কিয়দংশ, তাহারই কিছু পূর্ব্বে অযোধ্যা। মধ্যে অন্য কোন জনপদ ছিল বলিয়া জানা যায় না। খুব সম্ভব প্রাচীন অযোধ্যা জনপদই পঞ্চালদেশের পূর্ব্বসীমা ছিল এবং বর্ত্তমান অযোধ্যার কিয়দংশ পঞ্চালদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অতি প্রাচীনকালের ভূগোল বিবরণের সহিত অধুনাতন ভূগোলবৃত্তান্তের সামঞ্জস্য করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। প্রায়ই সম্পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনেকাংশে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। এবিষয়ে উপায়ান্তর নাই। তথাপি অনুসন্ধিৎসু কিয়ৎপরিমাণে যে সফলমনোরথ হয়েন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। হয়ত এমন হইতে পারে যেটুকু ভুল ভ্রান্তি থাকিয়া যাইতেছে, তাহা ক্রমানুসন্ধিৎসার ফলে ভবিষ্যতে সংশোধিত

হইবে। মহাভারতাদি হইতে পঞ্চালদেশের যে প্রাচীন বিবরণ সঙ্কলিত করিলাম, তৎসম্বন্ধেও উপরিধৃত কথা প্রযুজ্য। মোটামুটি বুঝা গেল এই সুবিখ্যাত প্রাচীন জনপদ পঞ্চালদেশ কোথায় কোথায় অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান কালের মানচিত্র উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহাও বলা যাইতে পারে, আজকাল যে স্থান উত্তরপশ্চিম প্রদেশ বলিয়া কথিত (United Provinces of Agra and Oudh), অযোধ্যার কিয়দংশ ব্যতীত তাহার অধিকাংশ ভূভাগই প্রাচীন পঞ্চালদেশের (উত্তর পঞ্চাল ও দক্ষিণ পঞ্চালের) অন্তর্গত ছিল।

বাঙ্গালা কবিতার ভাষা ও ভাব

বিগত কার্ত্তিকমাসের "প্রবাসীতে" বাবু দ্বিজেন্দ্র লাল রায় "কাব্যের অভিব্যক্তি" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে শ্রাবণের "বঙ্গদর্শনে" কোন লেখক "কাব্যের প্রকাশ" নামক প্রবন্ধে অস্পষ্ট কাব্যের সমর্থন করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রবাবুকে বাঙ্গালার অস্পষ্ট কবিদের অগ্রণী বলিয়াছেন এবং তাঁহার "সোনার তরী" নামক ক্ষুদ্র কবিতার অতি তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। এই সমালোচনা যদি যথার্থ ও প্রমাদশূন্য হইত তাহা হইলে কাহারো কিছু বলিবার ছিল না। কিন্তু তাহা হয় নাই। প্রবন্ধটি পড়িয়াই মনে হয় স্পষ্ট কাব্যের সমর্থন উপলক্ষ মাত্র; প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য রবিবাবুকে উপহাসাস্পদ করিয়া তাঁহার প্রতি কিয়ৎপরিমাণে গালিবর্ষণ করা। দ্বিজেন্দ্র বাবু

নিজে কবি এবং সুলেখক, তাঁহার এ কাজটি আদৌ ভাল হয় নাই। ইহা কবিজনোচিত নহে এবং দ্বিজেন্দ্র বাবুরও উপযুক্ত নহে। তিনি কবিসমাজে নিজের উচ্চাসনের কথা হঠাৎ ভুলিয়া গিয়া সমালোচকের আসন গ্রহণ করিয়াছেন এবং অযথা বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ কবিকে অন্যায় আক্রমণ করিয়াছেন। সুধু সমালোচক হইয়া ক্ষান্ত হন নাই; রবি বাবুর ক্ষুদ্র কবিতাটির বর্ণনার ভুল, কথার মানের ভুল, প্রভৃতি দেখাইতে চেষ্টা করিয়া ইহার একটি Annotated Edition লিখিয়া ফেলিয়াছেন। আমি "বঙ্গদর্শনের" এবং "প্রবাসীর" একজন পাঠক। এই "কবির লড়াই" আমার নিকট নিতান্ত অপ্রীতিকর বোধ হইল। বোধ হয় "প্রবাসীর" অধিকাংশ পাঠকই আমার সহিত একমত হইবেন। এজন্য এক্ষেত্রে আমার কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা হইল।

দ্বিজেন্দ্র বাবু হঠাৎ এত চটিলেন কেন বলিতে পারি না। বোধ হয় কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ চটিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ফল্গুর অন্তঃসলিলে কিরূপ খরস্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে তাহা আমরা জানি না। আমরা বাহিরের লোক জানিবার দরকারও নাই। তবে তিনি অত্যন্ত চটিয়াছেন নিশ্চয়। এরূপ ক্ষেত্রে অত্যন্ত চটিলে যাহা হয় (অর্থাৎ ক্রোধ নিষ্ফল হয় এবং নিজের ক্ষতি হয়) তাহাই হইয়াছে। যাঁহাকে রাগের মাথায় আক্রমণ করিয়াছেন তাঁহার কোনই ক্ষতি হইবে না এবং লোকে অন্ততঃ বলিবে দ্বিজেন্দ্রবাবুর কাজটি তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির উপযুক্ত হয় নাই।

"কাব্যের প্রকাশ" প্রবন্ধ কে লিখিয়াছেন তাহা প্রকাশ নাই। তিনি যিনিই হউন না কেন তাঁহার লেখায় বুদ্ধিমত্তার

বিশেষ পরিচয় দেখিলাম না। তিনি অতি অস্পষ্ট ভাবে অস্পষ্ট ভাষায় অস্পষ্ট কাব্যের সমর্থন করিয়াছেন। "অস্পষ্ট কাব্য" হয় না। সোণার পাথরের বাটী হয় না। তিনি বলেন, তাঁহার মাথায় "আইডিয়া" ঢোকে, অনেক কালের জমাট বাঁধা idea হঠাৎ একদিন তাঁহার কবিতার নেশায় বাহির হইয়া পড়ে। তিনি কি কাব্য লিখেন অনেক সময় নিজেই তাহা বুঝিতে পারেন না। এইরূপ কবিতা অতি উচ্চদরের এবং ইহা miraculous। Fudge! যদি ideaটাই কেহ বুঝিতে পারিল না, কাহারও কোন উপকারে আসিল না তবে সে ideaর কপালে ছাই, তাহাকে কর্ম্মনাশার জলে ফেলিয়া দিলেই ভাল হয়। এই লেখক আবার জাঁক করিয়া বলেন "আমার ভাবের যে অস্পষ্টতা, তাহা যদি কেহ কল্পনার আলোকে স্পষ্ট করিয়া লইতে পারেন তবেই পারিলেন নচেৎ আমার কাব্য তাঁহার নিকটে চিরদিনের মত রুদ্ধ রহিল"। এইরূপ কবির কাব্য বুঝিতে পারিল না বলিয়া, পাঠকের ত আর ঘুম হইবে না, বাসায় গিয়া ছট্‌ফট্ করিবে! লেখক বাস্তবিক "কাব্যের প্রকাশ" না লিখিয়া "পত্থের প্রকাশ" লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক উপসংহারে বলিয়াছেন, "অনেকেই সাদা কথায় ছন্দঃ মিলাইয়া মিলাইয়া বয়ন করেন, ইহাঁদের 'বর্ণিমে' খুব চমৎকার। কিন্তু পৃথিবীতে ইহাঁদিগের স্পষ্টতা সত্ত্বেও কেহই ইহাদিগকে আজও বড় বলিল না"। দ্বিজেন্দ্র বাবু এই শেষোক্ত ব্যঙ্গেই বোধ হয় ভারি চটিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে একজন স্পষ্ট কবি। স্পষ্ট কবির নিন্দা তাঁহার সহ্য হইল না; একটা তীব্র প্রত্যুত্তর দিলেন। সহজ প্রত্যুত্তরে কাহারও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। তিনি যদি সাধারণ ভাবে বুঝাইয়া দিতেন স্পষ্ট কবিই কবি তাহা হইলে

কোন গোল থাকিত না। তিনি অকারণ রবিবাবুকে টানিয়া আনিয়া ব্যাপারটা Personal করিয়া ফেলিলেন। শুধু তাহাই নহে রবিবাবুর "সোণার তরী" টিকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিলেন যে রবিবাবুর কবিতা কিছুই নহে ইহা অর্থশূন্য ও স্ববিরোধী। এইটিই হইয়াছে অত্যন্ত দোষের। তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সাধারণ কাব্য সম্বন্ধে তাঁহার conclusions ঠিক কিন্তু তাঁহার প্রমাণ প্রয়োগের method অত্যন্ত দূষণীয় এবং প্রমাদপূর্ণ। আর রাগের মাথায় একটা ছোট কবিতার ভুল ধরিতে গিয়া নিজে অনেক বড় বড় ভুল করিয়াছেন। সেইগুলিই আমরা একটি একটি করিয়া দেখাইতেছি।

প্রথমতঃ দেখা যাক্। দ্বিজেন্দ্রবাবু বোধ হয় ধরিয়া লইয়াছেন "কাব্যের প্রকাশ" প্রবন্ধ হয় রবিবাবুর লেখা না হয় তাঁহার ইসারা মত তাঁহার কোন ভক্তের লেখা। অন্ততঃ তাঁহার মতে এটি রবীন্দ্র বাবুর মতের প্রতিধ্বনি মাত্র। দ্বিজেন্দ্র বাবু এ কথার কোন প্রকার প্রমাণ দেন নাই। এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না। আর আসল মতের প্রতিবাদ না হইয়া "মতের প্রতিধ্বনির" প্রতিবাদ হয় কেন? একটা অপকৃষ্ট মত রবিবাবুর বলিয়া প্রকাশ করিলে, তাহার উপযুক্ত প্রমাণের আবশ্যক। সেরূপ প্রমাণের অভাব। পক্ষান্তরে এইমত যে রবিবাবুর নহে এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। অবশ্য লিখিত মতই ধর্ত্তব্য। রবিবাবু কোন লেখায় "কাব্যের প্রকাশ" লেখকের মতে একমত হইয়াছেন এ কথা আমরা জানি না। রবিবাবু "মেঘনাদবধ কাব্য" নামক একটি ছোট প্রবন্ধে এক জায়গায় বলিয়াছেন "একবার বাল্মীকির ভাষা

পড়িয়া দেখ দেখি বুঝিতে পারিবে মহাকবির ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, হৃদয়ের সহজ ভাষা কাহাকে বলে?" "চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি" নামক লেখায় রবিবাবু বলিয়াছেন, "সহজ ভাষার সহজ ভাবের সহজ কবিতা লেখাই শক্ত, কারণ তাহাতে প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে হয়"। আর এক জায়গায় বলিয়াছেন "আমাদের চণ্ডীদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি"। রবিবাবু একথাও বলেন যে সহজ কথায় বড় বড় কবিরা কখন কখন অনেক অধিক ভাব প্রকাশ করিয়াছেন সেই জন্য তাহাদের সহজ কথা মাঝে মাঝে নিতান্ত শক্ত হইয়া পড়ে। দ্বিজেন্দ্র বাবুও ঠিক এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "শেলি ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্ অনেক সময় অনেক খানি ভাব অল্প কথায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে অনেক স্থলে ভাব ঘনীভূত হইয়া কাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে; কোন কোন ভাব এত বেশী ঘনীভূত হইয়াছে, যে দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে ও সৌন্দর্য্যের হানি করিয়াছে।" ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে কাব্যের ভাষা ও ভাব লইয়া রবিবাবুর ও দ্বিজেন্দ্রবাবুর বিশেষ মতভেদ নাই। কেবল দ্বিজেন্দ্রবাবুর বুঝিবার ভুল। তিনি কল্পনায় অসুর সৃষ্টি করিয়াছেন। মোহিতবাবু সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে একটি কবিতায় রবিবাবু এইরূপ বলিয়াছেন;

"কতজন মোরে ডাকিয়া কয়েছে
যা গাহিছ তার অর্থ রয়েছে কিছু কি?
তখন কি কই নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি "অর্থ কি জানি"।
তারা হেসে যায়, তুমি হাস বসে মুচুকি।"

এই ক্ষুদ্র কবিতাতে কবির নিজ অভীষ্টদেবতার প্রতি আত্মনিবেদন আছে। বোধ হয় যাঁহারা তাঁহার কবিতার তত সমাদর করেন না তাঁহাদের প্রতি উন্নত হৃদয়ের পরিচায়ক একটি প্রত্যুত্তর এই কবিতাতে আছে। রবিবাবুর কাব্যগ্রন্থে ভূরি ভূরি আভ্যন্তরীণ প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি "বঙ্গদর্শনের" প্রবন্ধ লেখকের মত কখন সমর্থন করেন নাই। তিনি রাশি রাশি কবিতা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে অধিকাংশ কবিতাই উচ্চদরের ও সহজ সুমিষ্ট ভাষায় লিখিত। তাঁহার প্রথম বয়সের কবিতাবলী, ভানুসিংহের পদাবলী, লোকালয় প্রভৃতি এবং বর্ত্তমান সময়ের কবিতাবলী ইহার প্রমাণ। তাঁহার সব কবিতা যে সমানভাবের হইবে ইহা আশা করা অন্যায়। একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে "রবিবাবু অস্পষ্ট কাব্যের সমর্থক" এটা নিতান্তই ভ্রান্তমত। তবে প্রত্যেক প্রতিভাশালী কবির মধ্যে একটু miraculous ভাব আছে। রবিবাবুর "লোকালয়" নামক কাব্যের প্রারম্ভে এক জায়গায় আছে ;

"হে রাজন্, তুমি আমারে
বাঁশি বাজাবার দিয়েছ যে ভার
তোমার সিংহ দুয়ারে—
ভুলি নাই তাহা ভুলি নাই।"

এখানেও বোধ হয় একটু miraculousএর গন্ধ আছে। কিন্তু এ কথাটা বাস্তবিক সত্য যে ভগবান্ এক একজনকে এক একটি missionএ প্রেরণ করিয়াছেন। প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারেন তাঁহাদের ভিতরে একটা Divine spark আছে। Genius is conscious। তাঁহার ভিতরে একটা কিছু আছে যাহা অন্যেতে নাই। Geniusএর capacity for

taking infinite pains আছে কিন্তু কেবলমাত্র যাঁহার capacity for taking infinite pains আছে তিনিই Genius নহেন। তাহার উপরে আরো একটা কিছু আছে। কবি Gray কয়েক বৎসর ধরিয়া ঘসিয়া মাজিয়া Elegy লিখিয়াছেন। সকল কবিকেই Gray-এর পথ অবলম্বন করিতে হইবে এমন নহে। আর Gray একটা মস্ত প্রতিভাশালী কবিও নহেন।

দ্বিজেন্দ্রবাবু উপরোক্ত ভ্রান্তমতের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বড় রকমের ভ্রান্তমত প্রচার করিয়াছেন। দুইটিই এক শ্রেণীর। দ্বিজেন্দ্রবাবু বলেন "আমাদের দেশে এই অস্পষ্ট কবিদের অগ্রণী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"। এই উক্তিরও কোন মূল নাই এবং ইহাও কবিসুলভ কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রবন্ধমধ্যে এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ প্রয়োগ নাই। প্রথম দেখানি চাই কাহারা অস্পষ্ট কবি এবং তাহার পর দেখাইতে হইবে বাস্তবিক রবিবাবু তাঁহাদের অগ্রণী কিনা। গায়ের জোরে অন্ধকারে ঢিল মারিলে কোন ফল নাই। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি রবিবাবু নিজে আদৌ অস্পষ্ট কবি নহেন।

দ্বিজেন্দ্রবাবুর আর একটী ভ্রান্তমত "রবিবাবুর ভক্তগণ, রবিবাবুর "সোণার তরী"কে তাঁহার সকল কবিতার প্রায় শীর্ষে স্থান দেন"। এটাও একটা মনগড়া কথা এবং কাহারা রবিবাবুর ভক্তগণ তাহার নির্দ্দেশ নাই। কয়েকটা সভায় "সোণার তরী"র আবৃত্তি হওয়াতে তাহার শীর্ষে স্থান ইহা প্রমাণিত হইল না। রবিবাবু আমাদের দেশের বর্ত্তমান কালের একজন শ্রেষ্ঠ ভাবুক কবি। যাহারা তাঁহার কবিতা আবৃত্তি করিতে প্রস্তুত তাহারা তাঁহার যে কোন কবিতা আবৃত্তি করিতে পারে। যাহাদের যেরূপ রুচি বিদ্যাবুদ্ধি তাহারা তদনুযায়ী একটা কবিতা

আবৃত্তি করিবার জন্য বাছিয়া লইবে। যে কবিতা ছোট বা সহজবোধ্য এবং শুনিতে সুমিষ্ট প্রায় এইরূপ কবিতাই আবৃত্তির জন্য বাছা হইয়া থাকে। কোন কবির শ্রেষ্ঠ কবিতাই যে আবৃত্তির জন্য নির্ব্বাচিত হয় এরূপ সব সময় ঘটে না। কোন একজন সমালোচক "সোণার তরী" পড়িয়া লিখিয়াছিলেন "তাঁহার সোণার লেখনী অক্ষয় হউক"। ইহাও ঐ কবিত্বের শ্রেষ্ঠত্বের কোন প্রমাণ নহে। সমালোচক কত রকমের আছে। ফোর্থ ক্ল্যাস্ পড়া বালকও কখন কখন সমালোচকের টুপি মাথায় দিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের বাজারে বাহির হইয়া থাকে। তার পর আজ কাল যে কোন লোক একখানা বই লিখিলেই অধিকাংশ সমালোচকের মতে তিনি অক্ষয় সোণার লেখনীর অধিকারী হইয়া থাকেন। রবিবাবুর ত কথাই নাই; রবিবাবু যদি নিজে বলেন তাঁহার "সোণার তরী" তাঁহার অন্যান্য কবিতার শীর্ষস্থানে তাহা হইলেও লোকে তাঁহার মত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে না। পিতামাতার যেমন অনেক সময়ে দুর্ব্বল সন্তানের প্রতি অত্যাদর ও মমতা হয় কবিদেরও কখন কখন তাঁহাদের একটা যেমন তেমন কবিতার উপর সস্নেহ দৃষ্টি পড়ে।

ইহার পর দ্বিজেন্দ্রবাবু "সোণার তরী"র ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তাহার কথার মানে করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে এই কবিতাটী অর্থশূন্য এবং স্ববিরোধী। তিনি অত্যন্ত Prejudiced হইয়া লিখিয়াছেন এবং তাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। বাস্তবিক কবিতাটী রবিবাবুর অন্যান্য কবিতার প্রায় শীর্ষস্থানীয় না হইলেও ইহা একটী উৎকৃষ্ট ভাবময় কবিতা। দ্বিজেন্দ্রবাবু কোন কারণবশতঃ হঠাৎ Prejudiceএর বশবর্ত্তী হইয়া এমন সকল ভুল ব্যাখ্যা ও মানে করিয়াছেন যাহা

তাঁহার মত লোকের আদৌ করা উচিত ছিল না। সেইগুলিই আমরা ক্রমশঃ দেখাইয়া দিতেছি।

দ্বিজেন্দ্রবাবু "সোণার তরী"র গদ্যার্থ ও পদ্যার্থ বাহির করিয়াছেন। কোন কবিতার গদ্যার্থ ও পদ্যার্থ বলিয়া দুটা অর্থ আছে এরূপ সকলের প্রতীতি হইবে না। তবে তাঁহার লেখার ভাবে বোধ হইতেছে কবিতা রূপক হইলে তাহার একটা সোজা গল্পের মানে এবং তাহার রূপক ভাঙ্গিয়া অপর একটা অর্থ অথবা আধ্যাত্মিক অর্থ হইতে পারে। দ্বিজেন্দ্রবাবু বলেন এই কবিতা-টীর গদ্যার্থ অত্যন্ত অস্বাভাবিক, কারণ কোন কৃষক রাশি রাশি ধান কাটিয়া কূলে নির্ভরসা হইয়া বসিয়া থাকে না; সে ধান সে বাড়ী লইয়া যায় এবং ধান কাটিয়া গৃহে না লইয়া গিয়া স্ত্রীপুত্র-গণকে বঞ্চিত করিয়া, এক "যেন মনে হয় চিনি" মাঝির সহিত পলাইয়া যাইতে চাহে না। বেশ ভাল কথা। আর একটা উদাহরণ দিতেছি। অনেক সময়ে অনেক উৎকৃষ্ট উপন্যাস পড়িবার সময় গল্পে পাওয়া যায় নায়ক অথবা গল্পের অন্য কোন ব্যক্তি খুব ঝড় বৃষ্টির সময় অশ্বারোহণে বা পদব্রজে প্রান্তর বা কোন পথ অতিক্রম করিয়া চলিতেছে। এখানে বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রবাবুর যুক্তি অনুসারে বলা যাইতে পারে গল্পাংশটা ভারি অস্বাভাবিক। ঝড় ও বৃষ্টির সময় কেহ পথে বাহির হয় না, সকলে দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতরে থাকে। অত-এব এরূপ উপন্যাস অস্বাভাবিক এবং পড়িবার অযোগ্য। একটু ভাবিয়া দেখিলে যাহা হঠাৎ অস্বাভাবিক মনে হয় তাহাই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতে পারে। তাহার উপর আবার ভিন্ন রুচি আছে। দ্বিজেন্দ্রবাবুর একখানি নাটকে এক রাজপুত্র তাঁহার আপনার ভগিনীকে বলিতেছেন, "তুই যদি আমার স্ত্রী

হতিস্ তাহ'লে বোধ হয় মাথায় চড়্তিস্।" ইনি আর এক জায়গায় বলিতেছেন "দেখ্ তোরা আমার দুই বোন্, আর আমি তোদের ভাই। কিন্তু রোজ রোজ আমার সাম্‌নে এমনি ঝগড়া করিস্ যেন আমি তোদের স্বামী আর তোরা দুই সতীন"। এই নাটকেই আর এক জায়গায় আছে আকবর কন্যা হঠাৎ সন্ধ্যায় এক অপরিচিত রাজপুত বীরের শিবিরে উপস্থিত এবং এ কথা সে কথার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আপনি কি বিবাহিত?" অনেকের কাছে এগুলি তত স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে না! এই অস্বাভাবিকতার আপত্তি গোড়ায় তুলিলেই সব গোল চুকিয়া যাইত। তরী সোণার হয় না, কাঠের বা লোহার হইয়া থাকে। দুনিয়ার মধ্যে কাহারও বোধ হয় সোণার তরী নাই। কাজে কাজে "সোনার তরী" কবিতা হইতে পারে না এ কথা বলিলেই বহুপূর্ব্বে সোনার তরী ডুবিয়া যাইত!

এই বার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। ইহার জন্য দ্বিজেন্দ্রবাবু রবিবাবুর অনেক ভক্তের নিকট গিয়াছিলেন, তাঁহারা "এ্যা—ও —কি জানি" বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়াছেন। পরিশেষে একজন ভক্ত তাঁহাকে একটা লাগশৈ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এক্ষণে কথা হইতেছে এই ভক্তগণ কাহারা। যাঁহারা ভক্তির পাত্র কবির কবিতার মানে জানেন না তাঁহারা কি রকম ভক্ত এবং তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কত দূর বলিতে পারি না। ভক্ত অনেক রকম হইতে পারে। কবির গাড়ু গামছা বওয়া ভৃত্য, পাচক নাপিত ইহারাও কবির ভক্ত হইতে পারে। তাহারাও হয় ত বলে "বাহোবা আমাদের বাবু, ইনি কেমন কবিতা লেখেন!" ভক্তের পরিচয় না পাইলে তাহাদের "এ্যাঁ ওঁ" ব্যাখ্যা লাগশৈ বোধ হয় না। আর দ্বিজেন্দ্রবাবুর এই ভক্তদের বাড়ী

হাঁটা হাঁটী করিবার কি প্রয়োজন ছিল তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না। সোণার তরীর উপর একটা প্রবন্ধ না হয় নাই হইত। আর দ্বিজেন্দ্রবাবু নিজের বিদ্যাবুদ্ধির জোরেও ত একটা লাগশৈ ব্যাখ্যা খাড়া করিতে পারিতেন। মানুষ Prejudiced হইলে সোজা পথে চলিতে চায় না।

এক্ষণে রবিবাবুর তথাকথিত ভক্তের লাগশৈ ব্যাখ্যাটা একবার বিচার করা যাক্। দ্বিজেন্দ্র বাবু এই ব্যাখ্যা যেরূপ দিয়াছেন তাহা এই। "কবি তাঁহার জীবনের সঞ্চিত ধন তাঁহার জীবনদেবতার পদে সমর্পণ করিলেন, পরে নিজের জন্য কিছু চাহিলেন। জীবনদেবতা তাঁহার ধনরাশির অর্থাৎ পরিশ্রমের ফল লইলেন, পুরস্কার দিলেন না। অর্থাৎ সকলেরই নিজের কর্ম্ম দেবতার চরণে অর্পণ করিবার অধিকার আছে; পুরস্কারে তাঁহার কোন দাবী নাই। ব্যাখ্যাটী বেশ আধ্যাত্মিক। ইহা ভগবদ্গীতার কথা। কিন্তু কবিতা হইতে কি এই অর্থ দাঁড়ায়?" দ্বিজেন্দ্রবাবু এই ভক্ত মহাশয়ের নাম দেন নাই। আমরা ইহাকে দ্বিজেন্দ্রবাবুর নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা বলিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। এই মনগড়া ব্যাখ্যার ভুল ধরিয়া দ্বিজেন্দ্রবাবু বলেন "যিনি আমার দেবতা তিনি এই মাঝির মত কোথা হইতে আসিয়া ভাসিয়া বিদেশে চলিয়া যান না, যাঁহাকে 'যেন মনে হয় চিনি' তাঁহাকে কেহই সর্ব্বস্ব অর্পণ করেন না" ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে বলেন, "আর আমাকে লহ" ইহার অর্থ কি সত্যই এই দাঁড়ায় যে "আমাকে কিছু দাও"। বড়ই দুঃখের বিষয় দ্বিজেন্দ্রবাবুর ন্যায় পণ্ডিতলোক এইরূপ অর্থশূন্য আপত্তি তুলিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু কি কখন "ভবনদীর কাণ্ডারী"র কথা শোনেন নাই। "ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা" এই শ্লোক চরণও কি কখন তাঁহার

কর্ণগোচর হয় নাই? "শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করা"র কথা কি খুব উচ্চদরের নহে? ভগবান্‌কে কি বলা যায় না "যেন মনে হয় চিনি"। দ্বিজেন্দ্র বাবু ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের যে সুবিখ্যাত "Ode on the Immortality of the soul"এর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও একটু "যেন চিনি মাঝির" ভাব আছে:

"Trailing clouds of glory do we come
From God who is our home."

তার পর তাঁহাকে কে বলিতেছে, "আমাকে লহ" ইহার মানে "আমায় কিছু দাও।" ভক্তের দোহাই থাকিলেও এই বিকৃত অর্থটা কল্পিত নহে কি? "আমাকে লহ" ইহার মানে যদি বাস্তবিক "আমাকে লহ" হয় তাহা হইলে ত আর বড় গোল থাকে না। "আমাকে নৌকায় তুলিয়া লহ", আমাকে তোমার চরণে স্থান দাও", "আমাকে মুক্তি দাও" এই অর্থ করিলে ত আর কল্পিত অসুরটাকে বধ করিতে হয় না। লাগশৈ ব্যাখ্যাদাতাটী ত রবিবাবুর বলিয়া বোধ হইতেছে না। ইনি দ্বিজেন্দ্রবাবুরই ভক্ত বা assistant। মুক্তিপ্রার্থনা সকলেই করে। দেবতা কৃষককে মুক্তি দিলেন না তাহার কারণ অত সহজে মুক্তি হয় না অথবা সে মুক্তি চাহিয়াছিল বলিয়া। একজীবনের যথাসর্ব্বস্ব দানে মুক্তি হয় না! এক আশুধান্যের জোরে বৎসর কাটে না। মুক্তি বহুসময়সাপেক্ষ এবং বহুজীবনের সর্ব্বস্বদান-সাপেক্ষ এবং তাহা চাহিবার কাহারও অধিকার নাই।

প্রত্যেক উৎকৃষ্ট রূপকময় কবিতারই যে একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যাখ্যা থাকিবে এরূপও হইতে পারে না। Tennysonএর "Idylls of the king" সম্বন্ধে যাহা হইয়াছিল তাহা বলিতেছি। একজন Bishop, কবিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন

"যাঁহারা আর্থারের সহচারিণী তিন রাণীকে Faith, Hope এবং Charity বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যা ঠিক কি না?" কবি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন "They are right and they are not right. They mean that and they do not. They are three of the noblest of women. They are also those three Graces, but they are much more. I hate to be tied down to say, '*This* means *That*', because the thought within the image is much more than any one interpretation." Tennyson তাঁহার কাব্যের নানা অর্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন "Poetry is like shot-silk with many glancing colours. Every reader must find his own interpretation according to his ability, and according to his sympathy with the poet." দ্বিজেন্দ্রবাবুকে আমি এই শেষোক্ত কথাগুলি বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিতে বলি।

দ্বিজেন্দ্রবাবু এই ক্ষুদ্র কবিতাটীর বর্ণনার ভুল ধরিয়াছেন। এইখানে ভুল ধরার চরম সীমা। তিনি বলিতেছেন "কৃষক ধান্য কাটিতেছে বর্ষাকালে, শ্রাবণ মাসে। বর্ষাকালে ধান কেহই কাটে না, বর্ষাকালে ধান্য রোপণ করে"। এই নিষেধাজ্ঞা বোধ হয় কলিকাতায় agricultural departmentএর আপিসে সোনার হরপে লেখা আছে। তার পর দ্বিজেন্দ্রবাবু ধানের বিভাগ করিয়া কাটিবার নিয়ম বলিয়াছেন যে, হৈমন্তিক ধান কাটে অগ্রহায়ণ মাসে, আশুধান কাটে ভাদ্র মাসে এবং বোরোধান কাটে উড়িষ্যায় বৈশাখ মাসে। ইহা ছাড়া অন্য কোন মাসে ধান কাটিলে তাহা বোধ হয় exceptional instanceএর

মধ্যে যাইবে। প্রথমতঃ ইহা পড়িয়া আমাদের একটু staggered হইতে হইয়াছিল। চক্ষুঃ বেশ করিয়া মুছিয়া ফের পড়িলাম দেখিলাম লেখাটা ঠিক পড়িয়াছি। শুনিয়াছি কলিকাতাবাসী কাহারো কাহারো বিশ্বাস ধানগাছে কড়িকাট হয়। ইহাঁরা যদি কেহ বলিতেন বর্ষাকালে ধান কাটে না তাহা হইলে বড় দোষের হইত না। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রবাবুর বিলাতী agricultural experience কি শেষকালে এই দাঁড়াইল? ধানটা কলিকাতার কাছে বিশেষ জন্মায় না। পূর্ব্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গেই ধানের আড়ঙ্। এই প্রদেশের প্রত্যেক জেলায়ই বোধ হয় শ্রাবণ মাসে আশুধান্য কাটে। আর এই শ্রাবণ মাসের ধান কাটা নিয়া অনেক মামলা মকদ্দমা হয়। এই প্রদেশের প্রত্যেক মুন্সেফ্ ও ডেপুটীবাবুদের মকদ্দমার নথী অন্বেষণ করিলে পাওয়া যাইবে শ্রাবণ মাসে অনেক ধান কাটা গিয়াছে। এ বৎসর এই শ্রাবণ মাসের আশুধান্য খাইয়া অনেক কৃষকে দুর্ভিক্ষের হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। ইহার উপর অন্য একজন তথাকথিত ভক্তের দোহাই দিয়া "শ্রাবণ মাস যদি বত্রিশে হয়, বলদ যদি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় নাড়ে" ইত্যাদি হাস্যরস অবতারণার চেষ্টা নিতান্ত অদ্ভুত রসে দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় অথবা আজকালকার যাত্রার দলে ইহার পসার হইতে পারে। তার পর দ্বিজেন্দ্রবাবু ভুল দেখাইয়াছেন "শ্রাবণ মাসে বর্ষা আসে না আষাঢ় মাসে আসে।" আষাঢ় মাসে প্রথমবর্ষার সূত্রপাত হয়। আর "বরষা" মানে কি "বৃষ্টি" হয় না? তার পর আপত্তি একখানি ছোট ক্ষেতে রাশি রাশি ভারা ভারা ধান হয় না। ধানগুলি কি সবই ঐ ছোট ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন? আর ঐ ছোট ক্ষেতের ধান হইলেই বা ক্ষতি কি? গরীব কৃষকের ছোট

ক্ষেতের ধানগুলিই তাহার কাছে রাশি রাশি ভারা ভারা। কৃষক বেচারীর বোধ হয় Experimental farm ছিল না! তার পর ক্ষেতের "চারিদিকে বাঁকাজল করিছে খেলা" বলিয়া ক্ষেত খানি দ্বীপ। আবার দ্বীপ হইতে হইতে চর হইয়া গেল! Great wits jump! অপূর্ব্ব ভৌগোলিকতত্ত্ব! বোধ হয় চর-জমি ছাড়া আর কোথাও ক্ষেতের চারিদিকে জল কেহ কোথাও দেখে নাই! চারিদিকে জল বলিলেই অবিচ্ছিন্ন ভাবে চারিদিকে জল বুঝিতে হইবে! হায় অন্ধ সমালোচনা! কেহ যদি বলে তাহার বাড়ীর চারিদিকে লোকের বাড়ী আছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার বাড়ী হইতে বাহির হইবার পথ নাই! কবিতাতে আছে মাঝী "তরী বেয়ে" আসিতেছে, তাহার পরই আছে "ভরাপাল"। দ্বিজেন্দ্রবাবু বলেন "ভরাপালে কেহ তরী বায় না"। দ্বিজেন্দ্রবাবু কি কখন ভরাপাল নৌকার হাল দেখেন নাই। হালটাও কি বাহিতে হয় না? এরূপ কথার মারপেঁচ নিম্নশ্রেণীর আইনজীবিদের মুখেই শোভা পায়। তার পর দেখিতেছি কোন নৌকা পারে আসিয়া "কোন বিদেশে" যাইতে পারিবে না। কবিতাতে আছে,

"পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়ামসী মাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাত বেলা"।

দ্বিজেন্দ্রবাবু বড়ই আহ্লাদের সহিত বলিতেছেন মেঘে ঢাকা গ্রামে তরুচ্ছায়া হয় না। দ্বিজেন্দ্রবাবু "মসী মাখা" কথাটার তাৎপর্য্য বা সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন নাই। মেঘ হইলে গাছের বাহিরে যে আলো থাকে গাছের তলায় ততখানি আলো

হয় না। কোন কোন সময় মেঘ হইলে গাছের তলায় কালো অন্ধকারের মত দেখায়। প্রভাতমেঘে এখানেও ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। আর ছায়া কথার মানে "বর্ণ" হইতে পারে। "ছায়া সূর্য্যপ্রিয়াকান্তিঃ প্রতিবিম্বমরনাতপম্।" এপার হইতে এ মসীমাখা ছায়া না দেখা যাইবার কারণ কি জানি না। কৃষকও কি on the *wrong* side of forty! শ্রাবণ গগনে মেঘ ঘোরে ফিরে না কেন তাহাও বুঝিতে পারি না। লাঠিমটা দ্বিজেন্দ্রবাবুর। শুধু ঘোরা ফিরার ত আপত্তি দেখি না। দ্বিজেন্দ্রবাবু রবিবাবুর কবিতার মিলেরও ভুল ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গায়ের জোরে ভুল ধরা চলে না। রবিবাবুর জীবন ভরিয়া এত মিল দিয়াছেন যে তাঁহার গোটাকত কবিতা গরমিল হইলেও বড় একটা যায় আসে না। বৃদ্ধ পিতামহকে গায়ত্রী শিখাইবার প্রবাদটাও অনেকে জানেন।

রবিবাবুকে তীব্র-আক্রমণ করাই দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রধান উদ্দেশ্য। "সোণার তরী"র কিঞ্চিৎ সুখ্যাতি তাঁহার অসহ্য হওয়াতে অনেক দিনের চেষ্টার পর কবিতাটিকে সমালোচনার কলে ফেলিয়াছেন। কবিতাটি বোধ হয় যেমন তেমনিই রহিল। তাঁহার উদাহরণটি বড় সুনির্ব্বাচিত হয় নাই এবং রবিবাবুর প্রতি অযথা আক্রমণ ও বড় ill-advised হইয়াছে। যদি রবিবাবুকে আক্রমণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হয় তিনি সোণার তরী'র পরিবর্ত্তে অন্য একটা নিকৃষ্ট কবিতা উদাহরণে তুলিতে পারিতেন। রবিবাবু এত কবিতা লিখিয়াছেন যে বিলাতী কবি Wordsworthএর মত তাঁহার কতকগুলি কবিতা খুব নীরস হইয়া পড়িয়াছে। ইহার একটাকে ছিন্নভিন্ন করিলেই চূড়ান্ত সমালোচনা হইত। কিন্তু তাহা বলিয়া কি রবীন্দ্রবাবুর প্রতিভার

কিছু হানি হইত? কোন কবির প্রত্যেক কবিতাই সমান প্রতিভার পরিচায়ক হইতে পারে না। গুণের ভাগ বেশী হইলে ক্ষুদ্র দোষ প্রতিভার লাঘব করে না। 'একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে, নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।'

ভক্তের দোহাই দিয়া কবিতার ব্যাখ্যা করা দ্বিজেন্দ্র বাবুর একটি নূতন পন্থা। কোন লোককে কোন কবির ভক্ত বলিলে কি বুঝায় ঠিক বুঝিয়া উঠা সুকঠিন। কাহারো কাহারো দুএকজন নির্দ্দিষ্ট কবির কবিতা ভাল লাগে। তাই বলিয়া কি তাহাদিগকে ভক্ত বলিতে হইবে। আর ভক্ত যে কবির মনোভাব ঠিক ব্যাখ্যা করিতে পারিবে তাহারই বা নিশ্চয় কি? যাহা সুন্দর যাহা উৎকৃষ্ট প্রত্যেক সংব্যক্তিই তাহার ভক্ত। কবিবিশেষের ভক্তামিতে বিশেষ বাহাদুরী নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবু রবিবাবুর কোন কোন অন্ধ ভক্তের নিকট কবির পরিচয় লইতে গিয়া ভাল কাজ করেন নাই। ভক্ত মহাশয়েরা তাঁহাকে বড়ই ঠকাইয়াছেন এবং তাঁহার নিজের সুনামের হানি করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। আর দ্বিজেন্দ্র বাবু বড় একটা etiquette বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছেন। তিনি নিজে কবি ও সুলেখক কিন্তু সমালোচক নহেন (যদিও প্রত্যেক মানুষের সমালোচক হইবার অধিকার আছে)। তাঁহার পক্ষে অপর একজন শ্রেষ্ঠ কবির একটি ক্ষুদ্র কবিতার অত বড় সমালোচনা করা কবির উপযুক্ত হয় নাই। কবিতে কবিতে মিল থাকা চাই। কবিদের মধ্যে লড়াইএর ভাব আমাদের মত সাধারণপাঠকের নিকট বড়ই হাস্যরসময় বলিয়া বোধ হয়। আর একটা বিষয় তাঁহার ভাবা উচিত ছিল। যিনি নিজে কাচের ঘরে বাস করেন, ত্রিতল কক্ষের দিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা তাঁহার উচিত নয়। একখানি ক্ষুদ্র উপলখণ্ড তাঁহার ভঙ্গুর গৃহের যথেষ্ট

সৌন্দর্য্যহানি করিতে পারে। বর্ত্তমান বাংলায় এমন কোন লেখক নাই যিনি গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারেন আমার লেখায় ভুল নাই। যে বই পড়িবে, দেখিবে পাতায় পাতায় ভুল। বাঙ্গালি লেখক এমনি অসাবধান এবং বাঙ্গালা ভাষার এমনি অদৃষ্ট। হয়ত কোন কোন লোক ইহার পর দ্বিজেন্দ্র বাবুর কেতাবের ভুল ধরিতে আরম্ভ করিবে। ক্রমে কবির লড়াই বাঁধিবে। কবি সমাজের এরূপ ভাব কোন প্রকারেই বাঞ্ছনীয় নহে।

প্রবন্ধের শেষাশেষি দ্বিজেন্দ্রবাবু কিঞ্চিৎ উদার এবং rational হইয়াছেন। রবিবাবুর "যেতে নাহি দিব", "পুরাতন ভৃত্য" প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা তাঁহার "নিজস্ব" এবং "মনুষ্য হৃদয়ের কমনীয় চিত্র" বলিয়াছেন! গোড়ায় কাটিয়া আগায় জল দিলে কি হইবে? এ উদার ভাবটা গোড়ায় হইলে তিনি এই প্রবন্ধ লিখিবার দায় এড়াইতে পারিতেন।

দ্বিজেন্দ্র বাবু আমাদের আধুনিক নব্য কবিগণ সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বড় বেশী আপত্তি করিবার কিছু নাই। তবে একটা sweeping remark করা চলে না। নব্য কবিগণের মধ্যে ২।৪ জন উত্তম লেখক আছেন। নব্যদের প্রধান দোষ তাঁহারা উপযুক্ত লেখাপড়া না শিখিয়াই অনুকরণ আরম্ভ করেন। অবশ্য প্রত্যেক নবীন কবিকেই প্রথমে অনুবাদ বা অনুকরণ করিতে হইবে। পিতা মাতার কথা শুনিয়াই শিশুর বুলি ফোটে। কিন্তু যে টুকু বিদ্যাবুদ্ধি থাকিলে অনুকরণের দোষ এড়ান যাইতে পারে তাহা অধুনাতন কবিদের অধিকাংশের নাই। Verse এবং প্রকৃত Poetry যে অনেক তফাত সে জ্ঞান অনেক বাঙ্গালী কবির নাই। বাঙ্গালা কবিতা লেখা বড় সহজ। মিল দিয়া verse লিখিয়াই তাঁহারা মনে করেন আমরা কবি হইলাম।

উপযুক্ত বিদ্যাবুদ্ধির অভাবে তাঁহারা নূতন ভাব লইয়া কোন কবিতা লিখিতে পারেন না। পৃথিবীর বড় বড় কবিরা sudden prodigies নহেন। দেবী সরস্বতী নিজের বরপুত্রদের সুবিধার্থে সহজে ডুব দিয়া উঠিবার জন্য কোন পুকুর কাটাইয়া রাখেন নাই। বাঙ্গালায় নব্য কবিরা Shelley অথবা Wordsworth না পড়িয়াই অথবা পড়িয়া না বুঝিয়াই তাঁহাদের সম্বন্ধে শোনা কথা শুনিয়াই মনে করেন কবিতার সহজ অর্থ না হইলেও ভাল কবিতা হইতে পারে, এবং এই ভাব হইতে যাহা খুসী তাহা লিখেন। Shelley, Wordsworth বা Tennyson এক এক জন Giant Intellect; ইহাঁদের সহিত ক্ষুদ্র বাঙ্গালী কবির তুলনাই হয় না। ইহাঁদের এক এক জনের সমস্ত কবিতা ভাল করিয়া বুঝিয়া পড়িতে অনেক দিন লাগে। ইহাঁদের অনুকরণ করাও অনেক সময়সাপেক্ষ। বিশেষতঃ দুই ভাষা কত স্বতন্ত্র। অথচ আমাদের দেশের নব্য কবিরা কেহ Shelley হইতেছেন কেহ Byron হইতেছেন কেহ কেহ বা Shakespere হইবার দাবী রাখেন। ইচ্ছা করিয়া চেষ্টা করিয়া অর্থ ঢাকিয়া যে নব্য কবিরা পদ্য লিখেন এ কথা আমি মানি না। ইহাতে অনেক বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন। সেকালের সংস্কৃত কবিরা ইহার উদাহরণ। বিলাতী কবিদের মধ্যে কেবল এক Robert Browning এর অখ্যাতি আছে যে তিনি অনেক Chinese puzzles লিখিয়াছেন। তাহা হইলেও তিনি এক জন বড় কবি এবং তাঁহাকে অনুকরণ করা নব্য বঙ্গীয় কবিদিগের পক্ষে বড় সহজ ব্যাপ্যার নয়। Mathew Arnold, Clough প্রভৃতি দুএক জন ইংরাজ কবির কতক গুলি ছোট ছোট কবিতা প্রথমতঃ বুঝিতে একটু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাঁহাদের

ভাষা জটিল নহে এবং একবার কবিতার ভাব বুঝিতে পারিলে তাহা জলের ন্যায় পরিষ্কার হইয়া পড়ে। Lowell এবং Holmes প্রভৃতি ২।১ জন মার্কিণ কবি ও লেখক চেষ্টা করিয়া নিজেদের লেখা একটু দুরূহ করিয়াছেন। এটী তাঁহারা কিছু বেশী পণ্ডিত বলিয়া; তাঁহারা চেষ্টা করিয়া নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করিয়াছেন। তাঁহারাও বাঙ্গালী কবির অনুকরণের অতীত। বাঙ্গালী কবিদের চেষ্টা করিয়া লেখা দুর্ব্বোধ করিবার ক্ষমতা নাই। কবিতার ভাষা ও ভাব সহজ না হইলে কাব্য উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। কেহ "নলোদয়" বা "রাঘবপাণ্ডবীয়"কে উৎকৃষ্ট কাব্য বলে না। "কিরাতার্জ্জুনীয়"ও বড় উচ্চদরের কাব্য নহে। পক্ষান্তরে সংস্কৃত সাহিত্যে যাঁহার সর্ব্বশীর্ষে স্থান সেই মহাকবির ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাঞ্জল; এবং ভাব ও সেই রূপ প্রগাঢ় অথচ সহজবোধ্য। কালিদাসের ভাষার ও ভাবের এতাদৃশ গৌরব না থাকিলে তাঁহার "শকুন্তলা" পৃথিবীর মধ্যে একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য হইত না। তবে এটুকু অবশ্য স্বীকার্য্য যে প্রতিভাসম্পন্ন কবিদের একটা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতাও আছে। সেই ক্ষমতার প্রভাবে তাঁহারা নূতন নূতন ভাব পৃথিবীতে আনিয়া লোকশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন এবং জাতীয় মাহাত্ম্য বাড়াইয়া গিয়াছেন। এই ভাব অস্পষ্ট নহে, ইহার ভাষাও অস্পষ্ট নহে। যেমন ভাবের উপর তেমনি ভাষার উপর তাঁহাদের অতুল প্রভাব।

সেকালের পুলিশ।

দুহাজার বৎসর পূর্ব্বে এদেশে পুলিশের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার একটু আলোচনা করা আজকালকার পুলিশ রিফর্মের দিনে, বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমাদের প্রাচীন কাব্য-নাটকে সেকালের ইতিহাসের ছায়া কিয়ৎপরিমাণে পাওয়া যায়। দু চারি খানি প্রাচীন নাটকে সেকালের পুলিশের বেশ নিখুঁত ছবি আছে। আমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক হইতে তাহারই উদাহরণ দেখাইতেছি।

শকুন্তলা শচীতীর্থজলে দুষ্যন্ত প্রদত্ত অঙ্গুরীয়টী হারাইয়াছিলেন। তৎপরে প্রত্যাখ্যাতা হইয়া কিছুদিনের জন্য মাতৃসন্নিধানে শান্তি-লাভ করিয়াছেন। দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবে রাজাও ব্যাকুল হৃদয়ে কাল কাটাইতেছেন। ইতিমধ্যে এক ধীবরের কাছে রাজ-নামাঙ্কিত আংটি পাওয়া গেল। ধীবর আংটি বেচিতে গিয়াছিল; পুলিশ টের পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। তাহার পর যাহা হইল "শকুন্তলা"র একটী প্রবেশক হইতে নিম্নোদ্ধৃত কথোপ-কথনে বুঝা যাইবে।

(১)

"নগর-রক্ষক এবং এক জন হাতবাঁধা পুরুষকে লইয়া দুই জন রক্ষীর প্রবেশ"।

রক্ষীদ্বয়। (পুরুষকে তাড়না করিয়া)। অরে বেটা চোর, বল্ কোথায় পেলি, এই পাথর বসান, রাজার নাম খোদা আংটী।

পুরুষ।—(সভয়ে) দোহাই হুজুরদের। আমি এমন কর্ম্ম করি নাই।

---

(১) মূলে আছে "নাগরিকঃ শ্যালঃ।" ইহার মানে রাজ-শ্যালক নগর-রক্ষক, পুলিশের বড় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অথবা পুলিশ কমিসনার। সেকালে

প্রথমরক্ষী। তুই চুরি করিস্ নাই! রাজা সুব্রাহ্মণ দেখে তোকে এই আংটিটি দান করেছেন।

পুরুষ।—হুজুর শুনুন। আমি শক্রাবতার গ্রামবাসী ধীবর।

দ্বিতীয় রক্ষী। বেটা চোর, আমরা কি তোর জাতিকুল বাড়ী জিজ্ঞাসা করিতেছি।

নগররক্ষক। ওহে সূচক, উহাকে আপনার মন মতন যথা ক্রমে বলিতে দাও। ইহার কথার মাঝখানে বাধা দিও না।

(২)

উভয়ে।—প্রভু যেমন আজ্ঞা করিতেছেন। বল্ বেটা বলে যা।

রাজশ্যালকেরাই প্রায় এই চাকরী পাইতেন। "নাগরিক" এই শব্দটির পর বিসর্গটী তুলিয়া দিলে অন্যরূপ অর্থ হইতে পারে। এরূপ পাঠান্তরও আছে। তাহাতে মানে হয় নগররক্ষকের শ্যালক অর্থাৎ রাজার শালার শালা। তাহাতে চাকরীটা কিছু ছোট হইয়া পড়ে। ইন্স্পেক্টর্ বা দারগা এইরূপ দাঁড়ায়। সম্ভবতঃ তাহাই হইবে। একেবারে খোদ রাজশ্যালক দুজন পাহারাওয়ালা লইয়া চোর ধরিবেন এটা তত সম্ভব নয়। নাটকে নগররক্ষকের চরিত্র বেশ একটু উচ্চভাবের হইয়াছে। তিনি বেশ পরিহাসরসিক অথচ গম্ভীর-প্রকৃতি, এবং বুদ্ধিমান্। সেকালের ইন্স্পেক্টারের এরূপ চরিত্র হওয়া অযৌক্তিক নহে। এই কথোপকথনের শেষভাগে দেখা যাইবে আংটিটি লইয়া নগররক্ষক সোজা-সুজি একেবারে রাজার কাছে চলিয়া গেলেন। ইহাতে কেহ মনে করিতে পারেন ইনি খোদ রাজশ্যালক। তাহা নাও হইতে পারে। পুলিশের অবারিত দ্বার।

(২) মূলে আছে "আবুত্ত"। তাহার মানে কেহ কেহ করিয়াছেন মাননীয় ব্যক্তি। "আবুত্ত" মানে ভগিনীপতি। কোন কোন টীকাকার ভগিনীপতি এইরূপই অর্থ করিয়াছেন। ইহাও বেশ সঙ্গত অর্থ। রাজ-শ্যালক নিজের শ্যালককে পুলিশের চাকরীতে ঢুকাইয়াছেন এবং শেষোক্ত

পুরুষ। আমি জাল বড়্শী দিয়া মাছ ধরি এবং তাহাতেই পোষ্য প্রতিপালন করি।

নগররক্ষক। (হাসিয়া) অতি পবিত্র পেশা বটে।

পুরুষ। প্রভু, পূর্ব্ব পুরুষের ব্যবসাটা নিন্দনীয় হইলেও ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। দেখুন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণও স্বভাবতঃ অতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেও যজ্ঞ করিবার সময় পশুমারণরূপ অতি নিষ্ঠুর কার্য্যেও ব্রতী হইয়া থাকেন।

নগর। তারপর, তারপর, বলে যাও।

পুরুষ। একদিন আমি খণ্ড খণ্ড করিয়া একটি রুই মাছ কাটিতেছি হঠাৎ মাছের পেটে এই উজ্জ্বল আংটিটি দেখিতে পাইলাম। তারপর আংটিটি বেচিতে আনিবার সময় আপনারা আমাকে ধরিয়াছেন। এই আংটি পাওয়ার বৃত্তান্ত আমি বলিলাম। এক্ষণে আপনারা আমায় মারুন, কাটুন বা ছেড়ে দিন।

নগর। ওহে জানুক, এই লোকটা জেলেই বটে; এর গায়ে আমিষ গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। আংটি পাওয়া সম্বন্ধে ইহার বিচার হওয়া উচিত। চল রাজবাড়ীতে যাওয়া যাক্।

রক্ষীদ্বয়। চলুন। চল্‌রে গাঁটকাটা চল্।

(সকলের গমন)

ব্যক্তি নিজের দুটি অকর্ম্মণ্য শ্যালককে নিম্নশ্রেণীর পুলিশ-কার্য্যে নিযুক্ত করাইয়াছেন। এরূপ শ্যালক পোষণ আজকালকার দিনেও বেশ দেখা যায়। আরো একটা মানে করা যাইতে পারে সেকালে "ভগিনীপতি" হয়ত একটা সম্মানসূচক সম্বোধন ছিল। আমাদের দেশে শালা কথাটা গালি বাচক। পশ্চিমে শশুরা, শালা, দুইই গালি। ইহার বিপরীত জামাতা ও ভগ্নীপতি সম্ভ্রমসূচক হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

নগর। সূচক, তোমরা দুজনে হুঁসিয়ার হইয়া এই লোক-টিকে পাহারা দাও। আমি অঙ্গুরীয় প্রাপ্তি সংবাদ রাজাকে জানাইয়া তাঁহার হুকুম লইয়া আসিতেছি।

উভয়ে। প্রভু আপনি রাজার অনুগ্রহ লাভ করিয়া আসুন।

(নগররক্ষকের প্রস্থান)

প্রথমরক্ষী। ও ভাই জানুক প্রভু বড় দেরী করিতেছেন।

দ্বিতীয়। ভাই রাজার দরবার পাওয়া কি সোজা। রাজার অবসর হবে তবে ত তাঁর সহিত দেখা হবে।

প্রথম। জানুকরে ভাই, এই বেটাকে মেরে ফেল্‌বার জন্য আমার হাত সুড়্ সুড়্ কর্‌চে।

পুরুষ। হুজুর আমি নিরপরাধ ; বিনাদোষে আমাকে মেরে কেন বধের ভাগী হবেন।

দ্বিতীয়। এই যে আমাদের প্রভু রাজার আদেশ নিয়া হুকুমনামা পত্র হাতে এই দিকেই আস্‌চেন। (পুরুষের প্রতি) এই বার তোকে শকুনিতে খাবে কিম্বা কুকুরের মুখে পড়্‌বি।

(নগররক্ষকের পুনঃপ্রবেশ)

নগর। সূচক, এই মৎস্যজীবীকে ছাড়িয়া দাও। আংটি পাওয়ার কথা এ যাহা বলিয়াছে তাহাই সত্য বলিয়া রাজার বিশ্বাস হইয়াছে।

সূচক। যে আজ্ঞা প্রভু।

দ্বিতীয়। বেটা যমের বাড়ী গিয়ে ফিরে এলো।

(পুরুষের বন্ধনমোচন)

পুরুষ। (নগররক্ষককে প্রণাম করিয়া) প্রভু আমি আপ-নার নিকট কেনা হইয়া রহিলাম।

নগর। তোমাকে রাজা পারিতোষিক দিয়াছেন। এই লও। অঙ্গুরীয়কের মূল্য স্বরূপ অর্থ গ্রহণ কর।

(অর্ঘ দান)

পুরুষ। (পুনঃপ্রণাম করিয়া অর্থ গ্রহণ) আমার প্রতি স্বামী বড় অনুগ্রহ করিলেন।

সূচক। অনুগ্রহ বলে ; শূলে থেকে নামিয়ে তোমায় হাতীর পিঠে চড়ান হইয়াছে।

জানুক। প্রভু, রাজ পরিতোষে বোধ হইতেছে আংটিটি রাজার কাছে মহামূল্য এবং বড় আদরের বস্তু।

নগর। আংটিটি বহুমূল্য বলিয়া নয়, অন্য কারণে রাজার নিকট বড় আদরের জিনিষ বোধ হইল। আংটি দেখিয়া রাজার কোন বাঞ্ছিত জনের কথা মনে হইয়াছিল। রাজার প্রকৃতি গম্ভীর হইলেও ক্ষণকালের জন্য অশ্রুতে তাঁহার নয়ন ভরিয়া গেল।

জানুক। প্রভু আজ মহারাজের প্রকৃত সেবা করিয়াছেন।

সূচক। এটাও বল, এই বেটা জেলের জন্য।

পুরুষ। মহাশয়গণ, এই পারিতোষিকের অর্দ্ধেক আপনারা আমার পুজোপহারের পুষ্পের মূল্য স্বরূপ গ্রহণ করুন।

জানুক। ঠিক বলিছিস্ ভাই। (৩)

সূচক। ভাই ধীবর, এখন তুই আমার অতিপ্রিয় বয়স্য হইলি। প্রথম বন্ধুত্ব সুরাসাক্ষী রাখিয়া করিতে হয়। এস সবাই মিলে শুঁড়ির দোকানে যাই।

(সকলের প্রস্থান)

---

(৩) এই কথাটা কোন কোন সংস্করণে নগররক্ষকের মুখে দেওয়া আছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তাঁহাকে একটু উঁচু দরের লোক করা হইয়াছে। রক্ষীরা যখন ধীবরের কথায় বাধা দিতেছিল, তিনি বুদ্ধিমত্তার সহিত তাহাদের নিবারণ করিয়াছিলেন, তিনি রাজার মানসিক অবস্থা বেশ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এরূপ লোক শৌণ্ডিকালয়ে যাইবার প্রস্তাব করার সম্ভব নয়। তবে কেহ বলিতে পারেন পুলিস বলিয়া সম্ভব।

পূর্ব্বোদ্ধৃত কথোপকথনে অতীতের কথা ভাবিবার ও বুঝিবার অনেক আছে। সেকালে চুরি বড় একটা ছিল না তবে চোরের বড় কঠিন শাস্তি হইত; কখন কখন প্রাণদণ্ড হইত। শূলে দেওয়া প্রভৃতি প্রাণদণ্ডের প্রণালীও অনেক প্রকার ছিল। এইরূপ অনেক কথা আছে। তাহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা কেবল সেকালের পুলিসের প্রকৃতিই আলোচনা করিব। ছবি কেমন সুন্দর ও উজ্জ্বল হইয়াছে, যেন একালের বিংশতি-শতাব্দীর পুলিসের নিখুঁত ছবি। সেকাল ও একালে কি ভয়ঙ্কর সাদৃশ্য। সেই নির্দ্দোষকে অকারণ প্রহার ও তাড়না। আসামী অপরাধ করিয়াছে কিনা তাহার প্রমাণাভাব এবং সে বিষয় বিচারাধীন, কিন্তু তাহাকে নির্যাতন করিবার প্রবল ইচ্ছা। আর আসামী খালাস হইলে কি মহাক্ষোভ। অবশ্য এসব নিম্ন-শ্রেণীর পুলিসের কথা, কিন্তু কিছু উপরেও ইহার হাওয়া লাগিবার আশঙ্কা আছে। আর একটা সাদৃশ্য আসামীর compensation অর্থেতে ভাগ বসাইবার প্রবল প্রলোভন। সুরাপানাভ্যাসে একালের পুলিস বোধ হয় সেকালকে হারাইয়া দেয়। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য রাজার সহিত পুলিসের কুটুম্বিতা। একালে 'লেকীন সাদ্দির' ব্যাপারটা নাই বটে, তথাপি প্রীতিটা কুটুম্বাপেক্ষা অনেক বেশী। সময়ের সময়ে পুলিসপ্রশ্রয় ভগ্নীপতির শ্যালক প্রীতি অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহার ভিতর কোন Biological Truth আছে কিনা তাহা দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বিচার করিবেন। আর সাক্ষীর জবানবন্দী দেওয়ার প্রথাও দেখিতেছি সেকালে ও একালে এক। এই ধীবর আসামী হইবার পূর্ব্বে তাহার Statement করিতেছিল। সে আপনার মন মতন গল্প বলিবে; যাহা জিজ্ঞাসা করা হইবে তাহার জবাব দিবে না।

অনেক সময় সাক্ষী tutored বলিয়া এরূপ হয়। কিন্তু এমনও অনেক সময় হয় সাক্ষী যে প্রণালীতে যেরূপ পর পর বলিবে তাহা আগে ঠিক করিয়া আসিয়াছে, তাহার ক্রমভঙ্গ হইলে সে আসল কথা বলিতে পারিবে না, এরূপ অবস্থায় বুদ্ধিমান্ নগর রক্ষকের প্রথা অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। সাক্ষীর নিজের হিসাবমত তাহার গল্প বলিতে দিলে কথাগুলি ঠিক ঠিক পাওয়া যাইবে।

এত কালের পরেও মানব চরিত্রের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই দেখিয়া মনে মনে সন্দেহ হয়, "The thoughts of men are widened with the process of the suns' এ কবি বাক্যের বুঝি কোন মূল্য নাই। জাতীয় উন্নতির অভাব হইলে লোকে চীন দেশীয় সভ্যতার তুলনা দিয়া থাকে ; কিন্তু কতকগুলি রীতি অতি প্রাচীনকাল হইতে এমন ভাবে চলিয়া আসিতেছে যে তাহার সংস্কার যেন অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

এই পুলিসের রিফর্‌ম যেন অসাধ্য বলিয়া বোধ হয়। বেশী মাহিয়ানা দিলে এবং লেখাপড়া জানা ভদ্রবংশীয় উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিলে উচ্চশ্রেণীর পুলিশের রিফর্‌ম্ সম্ভব। কিন্তু নিম্ন-শ্রেণীর পুলিসের সংস্কার কেমন করিয়া হইবে? ইহাদিগকে বেশী বেতন দিলে অথবা লেখা পড়া জানা লোক এই দলে দিলে ইহাদের উন্নতি হইবে না। তাহাতে বাবুয়ানা বাড়িবে। ইহারা দৌড়ধাপের কাজে আর যাইবে না ; এবং যে কাজের জন্য নিযুক্ত তাহার অনুপযুক্ত হইবে। হয়ত শেষে চাকর রাখিয়া কাজ চালাইবে। এখনি অল্প বেতনে ইহারা যেরূপ বাবু ও বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, দু এক জায়গার অবস্থা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমি বাঙ্গালী কনষ্টেবলের কথাই বলিতেছি। ইহারা অতিরিক্ত বাবুয়ানা করে। কেবল ডিউটীর সময় পোষাক আঁটা

থাকিলেই বুঝা যায় ইহারা কনষ্টেবল। অন্য সময়ে ফিন্‌ফিনে কালাপেড়ে ধুতি উড়ুনী গায়ে দিয়া কনষ্টেবল বাবু চলিয়া গেলে কাহার সাধ্য চিনিতে পারে ইনি কনষ্টেবল! কাহারো কাহারো পায়ে ডসনের জুতা। Full বাবু পোষাকে কাদম্বরী রসভরে একটু মত্ত হইয়া ইনি যখন প্রণয়িনীর বাড়ীর দিকে উধাও হইয়া চলেন, তখন কে ইন্‌স্‌পেক্‌টার কে কনষ্টেবল চিনিবার যো নাই। ইহাদের বেতন অধিক বৃদ্ধি হইলে সঙ্গে সঙ্গে পদমর্য্যাদা বাড়িবে; যেখানে গরীবলোকে অল্পে পার হইত সেখানে তাহাদের ডবল লাগিবে। তবে অবশ্য বর্ত্তমান সময়ের বেতন বড়ই অল্প; এবং যে সকল ব্যক্তি সৎ তাহাদের সংসার যাত্রার জন্য আরো কিছু বেতন বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। কিন্তু তাহা হইলেও অত্যাচার নিবারণ হইবে না। আসল কথা ইহাদের বিশেষ training আবশ্যক। শুনিয়াছি, বিলাত, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের নিম্নপুলিসও অতি ভদ্র। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, পথ হারাইয়া গেলে, তৎক্ষণাৎ তাহারা প্রশ্নকারীকে সাহায্য করিয়া আপ্যায়িত করিবে। এখানে কোন কনষ্টেবলকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় "বাপু অমুক গলি অমুক বাড়ী কোথায়," তখনি উত্তর পাওয়া যাইবে "হাম্ কেয়া তোমারা নকর হ্যায়"? training এর দোষে এইরূপ হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর পুলিসকর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য ইহাদিগকে শিক্ষা দেয় যেন সাধারণ লোকদের সহিত ভদ্র ব্যবহার করে এবং ত্রুটির উদাহরণ পাইলে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে। বিলাত প্রভৃতি দেশে পুলিশ কি করিয়া এত ভাল হইল তাহার প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করা উচিত। কতকগুলি উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিমান্ পুলিশ কর্ম্মচরী যদি ঐ সব বিদেশে গিয়া তথাকার অবস্থা কিছু দীর্ঘকাল পর্য্যবেক্ষণ করেন, এবং বৈদেশিক প্রণালী এদেশে

কিরূপ ভাবে চলিতে পারে তাহার সুপরামর্শ দেন, তাহা হইলে এদেশীয় পুলিশের বহুল পরিমাণে উন্নতি হইতে পারে।

বিরাটপুরী ও মৎস্যদেশ।

রংপুর জেলায় গাইবান্ধা মহকুমার দক্ষিণপশ্চিম ভাগে বিরাট নামে একটী ক্ষুদ্রগ্রাম আছে। প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে এখানে একটী বৃহৎ মেলা হয়। এই মেলার সহিত প্রচীন ভারতের ইতিহাসের এবং কিয়ৎপরিমাণ হিন্দুধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে। সেই জন্য ইহার একটী ক্ষুদ্র বিবরণ নিম্নে দিতেছি।

ই, বি, এস্, রেলওয়ের মহিমাগঞ্জ নামে একটী ষ্টেশন আছে। শিয়ালদহ হইতে অপরাহ্ন ৫টার গাড়ীতে দার্জ্জিলিং মেলে উঠিলে পদ্মা পার হইয়া সারাঘাট দিয়া পরদিন প্রাতে ৬টা, ৬৷৹টার সময় মহিমাগঞ্জ পৌঁছান যায়। মহিমাগঞ্জের পর দুটী ষ্টেশন পরে গাইবান্ধা। মহিমাগঞ্জ হইতে হাঁটাপথে বিরাট ৯।১০ ক্রোশ হইবে। গরুরগাড়ী সর্ব্বদা পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বন্দোবস্ত করিলে পাল্কীও পাওয়া যাইতে পারে।

১লা বৈশাখের কিছু পূর্ব্ব হইতেই দোকান পসার আসিতে আরম্ভ করে। রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বড় বড় দোকান আইসে। কখন কখন কলিকাতা হইতে দুই একজন দোকানদার আসিয়া মনোহারী জিনিসের দোকান খুলে। নানা রকম তামাসা, দেশী সার্কাস, জুয়াখেলা, ভেল্কীবাজী প্রভৃতিও আসিয়া জুটে। পিতল, কাঁসা, তাঁবা, পাথর, কাঠ প্রভৃতি নির্ম্মিত নানা রকম জিনিস পাওয়া যায়। নানাদেশের

কাপড়, খাদ্য দ্রব্য, সময়োচিত ফল মূলাদিও পাওয়া যায়। চাউ-লের মহাজনেরা এখানে এই সময় যথেষ্ট পরিমাণে চাউল ক্রয় বিক্রয় করে।

মেলা অর্থাৎ জিনিস ক্রয় বিক্রয় এবং লোকসমাগম এখানে বৈশাখের প্রায় প্রতিদিনই হইয়া থাকে। তবে প্রতি রবিবারই যাত্রিদের বিশেষ মেলা এবং সেইজন্য অসংখ্য লোকসমাগম হয়। বৈশাখের প্রতি রবিবারই বহুদূর দূরান্তর হইতে ভদ্র অভদ্র নানা প্রকার লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এদেশের হাট-বাজারে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা বড় একটা যায় না। কিন্তু এই মেলায় স্ত্রীলোকেরা অবাধে এবং অগণিত সংখ্যায় যাতায়াত করে। কোন স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচারের বিষয় কখন শোনা যায় না। এদেশে অনেক গ্রামে স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচারী এক একদল গুণ্ডা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা প্রায়ই সুবিধা পাইলে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের প্রতি অত্যাচার করে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহ জেলায় এই-রূপ অত্যাচার বড়ই প্রবল হইয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ চেষ্টায় এই অত্যাচার অনেক দমন হইয়াছে। তথাপি ময়মনসিংহের অনেক জায়গায় এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে এখনো কিয়ৎপরিমাণে এই রূপ অত্যাচার চলিয়া আসিতেছে। এখানকার্ ফৌজদারী মকদ্দমার শতকরা ৯০টী এইরূপ স্ত্রীলোক বাহির করার জন্য অথবা অন্যপ্রকারে স্ত্রীলোকঘটিত। নিকা করিবার জন্য স্ত্রীলোক জোর করিয়া লইয়া গিয়া অনেক গুণ্ডা শেষে খুনাখুনী পর্য্যন্ত করিয়াছে এবং পাপের উপযুক্ত সাজা পাইয়াছে। এদেশে এই রূপ একটা ভয়ের কারণ আছে বলিয়া অতি গরীবের ঘরের স্ত্রী-লোকেরাও হাটে বাজারে বড় একটা বাহির হয় না। কিন্তু

কোন বড়মেলায় সময় তাহারা এনিয়ম রাখিতে পারে না। এই বিরাটের মেলায় স্ত্রী যাত্রীর সংখ্যাই বেশী। বিরাটে হিন্দুর মেলা। এইজন্য হিন্দুজাতীয় নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেই এখানে বেশী আসিয়া থাকে। ভদ্র স্ত্রীলোকেরাও গরুরগাড়ীতে থাকিয়া অথবা সুবিধাজনক জায়গায় বাসা করিয়া থাকিয়া তীর্থ করিয়া থাকেন।

কথিত আছে, এই বিরাটগ্রামই মহাভারতোক্ত বিখ্যাত মৎস্যদেশাধিপতি বিরাটের রাজধানী। এইখানে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব, ব্রহ্মবাদিনী প্রিয়তমা-পত্নী দ্রৌপদীর সহিত সম্বৎসর কাল অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহারা যেরূপ কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা মহাভারতজ্ঞ প্রত্যেক হিন্দুই বিশেষরূপে অবগত আছেন। অমিতবীর্য্য অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ত্যাগ করিয়া ক্লীব হইয়া এক বৎসর নারীমহলে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরকে অক্ষক্রীড়ায় এক বৎসর রাজার মনোরঞ্জন করিতে হইয়াছিল। ভীমপরাক্রম ভীমসেনকে পাচকের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। নকুল অশ্ববৈদ্য এবং সহদেব গো-বৈদ্য হইয়াছিলেন; আর কৃষ্ণ-পরায়ণা দ্রৌপদীর ত লাঞ্ছনা ও অবমাননার সীমা ছিল না। অনার্য্য-স্বভাবা রাজমহিষী সুদেষ্ণার অনার্য্য ভ্রাতা কীচকের হস্তে তাঁহার অবমাননার একশেষ হইয়াছিল; কেবল দুষ্টের দমনকারী কৃষ্ণের কৃপায় পাপীর সমুচিত দণ্ড হইয়াছিল। এই মহতী ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণার্থ এখানে এই বৃহতী মেলা হইয়া থাকে।

কতকাল হইতে এই মেলা চলিয়া আসিতেছে, বলা যায় না। পাণ্ডবদের মহাকষ্ট স্মরণ করিয়া, যাত্রীরা এখানে একদিন বা

ততোধিক দিন বাস করিয়া কষ্ট স্বীকার করিয়া যান। পূর্ব্বে, বোধ হয়, এই স্থানমাহাত্ম্য বেশীলোকের জানা ছিল না। বোধ হয় ৪০।৫০ বৎসর হইতে এইরূপ মেলার পত্তন চলিয়া আসিতেছে। মেলার মধ্যস্থলে স্বচ্ছবারিপূর্ণ একটী পুষ্করিণী আছে; ইহাতে স্নান করিয়া যাত্রীদের নূতন হাঁড়িতে ভাত রাঁধিয়া খাইতে হয়। ব্যঞ্জন কেবল তিক্ত করলা সিদ্ধ। এইরূপ করলা-ভাতে ভাত খাইয়া যাত্রীরা সমস্ত দিন ও একরাত্রি এখানে যাপন করেন। এখানে চাউলও যেমন প্রচুর, এই সময়ে করলাও সেইরূপ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এইরূপ কষ্টে আহার ও রাত্রিপ্রবাস করিয়া যাত্রিগণ একটী মহতী ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণ করিয়া থাকেন।

এখানে সচরাচর লোকে একটী অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকে। প্রত্যহ বহুসহস্র নূতন হাঁড়ি ব্যবহার হইয়া থাকে, এবং যাত্রিদের আহারের পর এই হাঁড়িগুলি পরিত্যক্ত এবং দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ভগ্ন-হাঁড়িগুলির বিশেষ কোন চিহ্ন পরদিন বা কয়েক দিন পরে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। লোকে বলিয়া থাকে, পরে একটী ভাঙ্গা "খোলামকুচি" ও দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাঙ্গা হাঁড়ি ও "খোলামকুচি" যে একেবারে পাওয়া যায় না, তাহা নহে; তবে চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিয়া মনে মনে একটা প্রশ্ন হইতে পারে, এত হাঁড়ি প্রতি দিন ব্যবহার হইতেছে, সেগুলি কোথায় গেল? আর প্রতিবৎসর বৈশাখমাসে যখন মেলা হইতেছে, তখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের কতক ভাঙ্গা হাঁড়ি বা খোলামকুচি কিছু কিছু পড়িয়া থাকা উচিত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার একটা এই উত্তর হইতে পারে যে, এদেশে বর্ষা

খুব প্রবল হয়, বর্ষার জলে সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলেও মেলার সময় একমাসের মধ্যে যত হাঁড়ি ব্যবহার হয়, তাহার ভগ্নাবশেষগুলি যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যেন যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। পুরীধামে যেমন রাস্তায় রাস্তায় সহরের চারিদিকে খোলামকুচি বিছান থাকে, তাহার সহস্রাংশের একাংশও এখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার হয়ত অন্য কোন রকম কারণ থাকিতে পারে; সাধারণ লোকে তাহার কিছুই জানে না।

এখানে আর একটী অলৌকিকত্বের কথা প্রচলিত আছে। তাহা এই। এখানে শৈবালপরিপূর্ণ অর্দ্ধপঙ্কিল জলময় দুতিনটী পুষ্করিণী আছে। লোকে বলে ইহার কোন একটীতে অবগাহন করিলে অবগাহনকারীর মৃত্যু নিশ্চিত। প্রাণভীরু বাঙ্গালী কখন ইহার কোন রকম experiment করিয়াছে বলিয়া শোনা যায় না। তবে দুএকজন ভদ্রলোক বলিলেন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে না জানিয়া অবগাহন করায় দুতিনটী লোক মারা গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এই পুকুরগুলির জল অতি কদর্য্য এবং কোনরূপ বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত এবং কেহ বলিলেন, ইহাতে অতি ক্ষুদ্র একজাতীয় বিষাক্ত সর্প আছে। কিয়দ্দূরে একটী পুকুরে কুম্ভীর আছে। কুম্ভীরের ভয়ে জলে কেহ নামে না। এখানকার বাস্তবিক কোন অলৌকিক মাহাত্ম্য থাকুক আর না থাকুক, এস্থান যে অতি রমণীয় এবং পুণ্যময়, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ ভূভাগ; লোকের বাস বড় একটা নাই। ঘনসন্নিবিষ্ট ছোট বড় নানাবিধ বৃক্ষরাজি ক্ষুদ্র অরণ্যের শোভাধারণ করিয়াছে। মধ্যে পরিখাময় একটী প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ; তাহাতে ক্বচিৎ উদ্যানবৃক্ষের

সুন্দর শ্যামল শোভা, ক্বচিৎ ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ প্রাচীন কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ইহার স্থানে স্থানে অনেক গুলি অযত্নরক্ষিত সরোবর প্রকৃতির শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। মনে হয় যেন কোন প্রাচীনকালের রমণীয় তপোবনে আসিয়াছি।

এখানে একপ্রকার নূতন সুমিষ্ট ফলবৃক্ষ দেখিলাম। নামে ক্ষীর বৃক্ষ বা ক্ষীরি-বৃক্ষ। ফলের নামও ক্ষীরফল। ফল সুমিষ্ট ও খুব সুস্বাদু, দেখিতে কতকটা দেশী খর্জ্জুরের ন্যায়। পাকিলে কতকটা হরিদ্রাভ হয় এবং একটু শাদাটে থাকে; অতি কোমল, ভিতর শাঁসে পূর্ণ এবং তাহাতে খেজুরের মতন আঁঠি নাই। পাড়িলে বোঁটায় একটু দুধের মতন আঠা বাহির হয়। জলে খানিকক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া পরে খাইতে হয়; দুগ্ধের সহিতও খাওয়া যাইতে পারে। সেকালের মুনি ঋষিরা স্বচ্ছন্দে এইরূপ সুমিষ্ট ফল খাইয়া তপোবনে বাস করিতে পারিতেন। সম্ভবতঃ এই ফল প্রাচীনকালের মুনিদিগের আশ্রমে পাওয়া যাইত। অভিজ্ঞানশকুন্তলোক্ত মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে ক্ষীর-বৃক্ষ থাকার উল্লেখ আছে। শকুন্তলা আশ্রম হইতে পতিগৃহে যাইতেছেন, সঙ্গে আছেন মহর্ষি কণ্ব ও তাঁহার শিষ্যদ্বয়, গৌতমী এবং দুটী প্রিয়সখী অনসূয়া এবং প্রিয়ম্বদা। সকলে কিয়দ্দূর গমন করিলে পর শিষ্যদ্বয় মহর্ষিকে বলিলেন, "ভগবন্, বন্ধুজনের উদকান্ত পর্য্যন্তই যাওয়া উচিত, এইরূপ শাস্ত্রে আছে; অতএব আপনারা এই সরসীতীরে আমাদের সম্ভাষণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করুন।" মহর্ষি বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হউক; আমরা এই ক্ষীর-বৃক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় লই"। আমার মনে হয় এই শকুন্তলোক্ত ক্ষীরবৃক্ষ এবং এই বিরাটের মেলায় যে ক্ষীরবৃক্ষ দেখিলাম, উভয় একই বৃক্ষ। কোন কোন টীকাকার ক্ষীরবৃক্ষের অর্থ বটবৃক্ষ

কিম্বা ক্ষীরস্রাবী অন্যান্য বৃক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ "ক্ষীরিবৃক্ষ" এই পাঠান্তর করিয়া "ক্ষীরি"র বটাদি অর্থ করিয়াছেন। তাহার কারণ অভিধানে আছে, "ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থপারিশপ্লক্ষপাদপাঃ। পঞ্চৈতে ক্ষীরিণো বৃক্ষাস্তেষাং ত্বক্ পঞ্চলক্ষণম্"। কিন্তু এই ব্যাখ্যা আরো সহজ ব্যাখ্যা হইতে পারে। ক্ষীরবৃক্ষ নামে স্বতন্ত্র বৃক্ষ আছে। প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। তপোবনাদিতে এই বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। কালিদাস যদি বট অথবা অশ্বত্থাদির কথা বলিতেন, তাহা হইলে সহজ ভাষায় সেই সহজ নামই করিতেন, একটা কঠিন শব্দের প্রয়োগ করিতেন না। ভাষার প্রাঞ্জলতাও কালিদাসের অদ্বিতীয় প্রতিভার একটী পরিচয়। যেমন ইঙ্গুদীবৃক্ষের কথা বলিয়াছেন, তেমনি ক্ষীরবৃক্ষেরও উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রীষ্মকালে বটচ্ছায়া সেবনীয় হইলেও এই ক্ষীরবৃক্ষ ঘনচ্ছায়া-সমন্বিত মহাবৃক্ষ বলিয়া সেবিতব্য। মহর্ষি কণ্ব দুহিতা লইয়া এইরূপ বৃক্ষেরই ছায়ায় দাঁড়াইয়াছিলেন।

এই বিরাটের মেলায় অনেক-গুলি ক্ষীরবৃক্ষ আছে। গাছগুলি দূর হইতে প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষের ন্যায় দেখায়। পাতাগুলি বড় বড়, কতকটা গাব পাতার ন্যায় এবং আরো বড় এবং ঘনসন্নিবিষ্ট এবং বৃক্ষগুলিও বৃহৎশাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। এই দারুণ গ্রীষ্মের সময় ইহার ফল সুপক্ক হয় এবং অতি সুস্বাদু বলিয়া অনেকে ইহার ফলের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকে। আম কাঁঠাল প্রভৃতি ফলবান্ বৃক্ষও চারিদিকে আছে। অরণ্যবৃক্ষ এবং উদ্যানবৃক্ষের বিচিত্র সমাবেশ। কোন স্থান মনোরম কুঞ্জবনের ন্যায়, কোন স্থান বা পবিত্র আশ্রমের ন্যায় রমণীয়। শুনা যায়, কখন কখন দুচারজন সন্ন্যাসী তপস্যার জন্য এখানে আসিতেন।

রাজাহার নামক গ্রামের নিকটস্থ একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলিলেন, একবার একজন তেজস্বী সন্ন্যাসী তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন, তিনি সমাধির জন্য খুঁজিয়া খুঁজিয়া এখানে আসিয়াছিলেন। কিন্তু নানারূপ বিভীষিকা দেখিয়া তিনি এখানে আর তিষ্ঠিতে পারিতেছেন না।

মেলার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ। একঘর দরিদ্র বৈষ্ণবজাতীয় গৃহস্থের এই ঠাকুর; বৈষ্ণবেই পূজা করিয়া থাকে। সম্প্রতি ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বন্দোবস্ত হইতেছে। পূজার বিশেষ কিছু আড়ম্বর নাই, পূজার জন্য বিশেষ কিছু আয়ও নাই; যাত্রিরা কেহ কেহ অতি সামান্য পূজা দিয়া থাকে; এই পূজা যাত্রিদের তত লক্ষ্য নহে। কষ্টে দিনযাপন ও রাত্রিবাস করাই এই মেলায় আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য।

ঠিক এইখানেই যে বিরাটরাজার পুরী ছিল, এবিষয়ে অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না; কিন্তু এখানে যে একজন পরাক্রমশালী রাজার রাজধানী ছিল, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কতকগুলি প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরাদির প্রস্তরখণ্ড, প্রস্তরনির্ম্মিত বহু দেবদেবীমূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। খুব বড় বড় বাড়ীর ইষ্টক স্তূপ, ভূগর্ভনিহিত পুরাতন ইটের প্রাচীর এবং ভিত্তির ভগ্নাংশ নানাস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। পরিখার চিহ্ন এখনো বর্ত্তমান আছে এবং প্রাসাদগুলির ভগ্নাবশেষের মধ্যে ৩।৪টী পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। একটী পুকুর বুজিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার একদিকে সোপানগুলি বর্ত্তমান আছে। বোধ হয়, রাজান্তঃপুরচারিণীদের জন্য এই সরোবরগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। সমস্ত ভূভাগ পরিদর্শন করিয়া সহজেই অনুমিত হয়, এখানে বহুকাল পূর্ব্বে এক বিশাল রাজপুরী

ছিল। যে দুএকখানি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে, তাহা দেখিয়া বোধ হয়, উৎকৃষ্ট প্রস্তর নির্ম্মিত দুএকখানি গৃহ বা দেব-মন্দির এখানে বর্ত্তমান ছিল। নিকটে পাহাড় নাই। কিছু দূরে গিয়া ব্রহ্মপুত্রের অপর পার হইতে পাথর আনিতে হইয়াছিল। নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামে প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অতি বিস্তীর্ণ ভূভাগে এই সকল প্রাচীন-কীর্ত্তি দেখিয়া ইহাই মনে হয়, এখানে কোন কালে এক সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল। প্রাসাদ-গুলির ইষ্টকের আকার দেখিয়া অবশ্য মনে হয় না যে, মহা-ভারতের সময়ে এই সৌধগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। তবে ইহা হইতে পারে, কোন রাজা বা রাজাবলী, বংশ পরম্পরায়, মহা-ভারতের বিরাটপুরী এইখানে ছিল মনে করিয়া, মধ্যে মধ্যে অট্টালিকাগুলির জীর্ণ-সংস্কার করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান গ্রামের নাম কিরূপে বিরাট হইল, ইহা একটু আশ্চর্য্যের বিষয়। শুধু বিরাট নয়, পার্শ্ববর্ত্তী একটী গ্রামের নাম কীচক। এই নামগুলি আজকালকার নয়, বহু বৎসরের, বহু শত বৎসরের। অশীতিপর বৃদ্ধেরা বলেন, তাঁহারা এই সকল নাম পুরুষানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছেন। নিকটে একটী মাটীর স্তূপের নিকট "বাণলিঙ্গ" নামে শিব আছে। এখানে একটি বড় মন্দির আছে। এই শিববিগ্রহ বিরাটপুরীর শিবলিঙ্গ বলিয়া কথিত। নিকটে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ আছে। লোকে বলে এগুলি শমীবৃক্ষ। অর্জ্জুন এক বিশাল শমীবৃক্ষে গাণ্ডীবাদি ধনুঃ ও অন্যান্য অস্ত্রাদি রক্ষা করিয়াছিলেন। সেখানে অবশ্য আরো শমীবৃক্ষ ছিল। কিন্তু সেই শমীবৃক্ষের বন আজও যে যথাস্থানে আছে, তাহা বিশ্বাস্য নহে। বিশেষতঃ অর্জ্জুন একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতস্থ শমীবৃক্ষে অস্ত্ররক্ষা করিয়াছিলেন। নিকটে কোন

পাহাড় নাই। তবে ক্ষুদ্র পাহাড় রাজরাজড়ারা বহুসহস্র বৎসরে কাটিয়া লোপ করিতে পারেন। কালে পাহাড়ও লোপ হয় এবং সমুদ্রের অবস্থিতি স্থানেও পর্ব্বতের স্থান হয়। গ্রামগুলির এই প্রাচীন ঐতিহাসিক নাম হইতে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, বহুশত বৎসর পূর্ব্বেও এই স্থানকে লোকে মহাভারতোক্ত বিরাট রাজার পুরী বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। মহাভারতের যেরূপ ভৌগোলিক বিবরণ লিখিত আছে, তাহা হইতেও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রংপুর জেলায় এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রাচীন মৎস্যজনপদ বর্ত্তমান ছিল। হয়ত সমগ্র উত্তর বাঙ্গালাই সেকালের বিস্তীর্ণ মৎস্যদেশ, সে কথা পরে বলিতেছি।

উপরে বলিয়াছি, স্থানে স্থানে অনেক সুন্দর প্রস্তর-মূর্ত্তি আজও পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার অধিকাংশই অত্যুৎকৃষ্ট শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক সুন্দর হিন্দু দেবদেবী মূর্ত্তি। ইহার মধ্যে মহিষাসুরমর্দ্দিনী সিংহবাহিনী ভগবতী মূর্ত্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মূর্ত্তিটী কিয়ৎপরিমাণে ভগ্নাবস্থায় আছে; এইজন্যই বোধ হয় অনাদৃত ভাবে রাধাকৃষ্ণ-মন্দিরের প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে পতিত রহিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, এদেশে পূর্ব্বে শক্তিপূজাই প্রচলিত ছিল এবং যাঁহারা এদেশের রাজা ছিলেন, তাঁহাদের দেবমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অসুর-বিনাশিনী বিজয়দায়িনী এই দুর্গামূর্ত্তি। অদ্যাপি রক্ষিত এই বৃহৎ বাণলিঙ্গ শিবমূর্ত্তি এবং এই ভগ্ন শিব-মন্দিরও তাহার আর এক বলবৎ প্রমাণ। মহাভারতের বিরাট-পর্ব্বে আছে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অজ্ঞাতবাসের জন্য রমণীয় বিরাট-নগরে প্রবেশ করিয়া ত্রিভুবনেশ্বরী ভগবতী দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন। এই স্তবে দুটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা আছে, একটী কংস স্বীয় ভগিনীর দুহিতা বলিয়া শিশু দুর্গাকে শিলাতলে

নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে, দেবী অনায়াসে তাহার হস্ত হইতে আকাশপথে গমন করিয়াছিলেন; আর একটী দেবী ত্রৈলোক্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত মহাসুর মহিষাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে, মহাভারতে মাঝে মাঝে ভগবান্ কৃষ্ণের সাধারণ-প্রচলিত বাল্যলীলার প্রসঙ্গ আছে এবং মহাভারতের সময়েও মহিষাসুরমর্দ্দিনী ভগবতীমূর্ত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। যুধিষ্ঠির তাঁহার স্তবে বলিয়াছেন, যশোদানন্দিনী নারায়ণপ্রণয়িনী কংসধ্বংস-কারিণী, অসুরবিনাশিনী, দিব্যবস্ত্রমাল্যবিভূষিণী এবং খড়্গখেটকধারিণী। তিনি বালার্কসদৃশা, চতুর্ভুজা, চতুর্বক্ত্রা, ময়ূরপুচ্ছবলয়া, কেয়ূর-ধারিণী, বিপুলবাহুযুগলা এবং নানায়ুধধারিণী। যুধিষ্ঠির স্তব-শেষে বলিতেছেন—"হে দুর্গে, আপনি দুর্গ হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া লোকে আপনাকে দুর্গা বলিয়া থাকে। কান্তারে অবসন্ন, জলধিজলনিমগ্ন, দস্যুহস্তে নিপতিত জনের আপনিই একমাত্র গতি। হে ভক্তবৎসলে শরণাগত-পালিকে দুর্গে, আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে আপনার শরণাপন্ন, আপনাকে প্রণাম করি, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।" অযত্নরক্ষিত বর্ত্তমান কালের এই দুর্গামূর্ত্তিও এই স্থানের অতি প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। এ অঞ্চলে আজ কাল আর শক্তি পূজা নাই। বুঝি বা শক্তি-উপাসনা হারাইয়া বিশাল বিরাট-পুরীর আজ এই ঘোর দুর্দ্দশা! এত বড় বিশাল রাজ্য কি কারণে একেবারে অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ নাই!

স্বচক্ষে এইস্থান দেখিলে এবং প্রাচীন কথা ভাবিলে বাস্তবিক চক্ষে জল আসে। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে এখানে নিবিড় জঙ্গল ছিল। প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নাবশেষের বিষয় অতি অল্প লোকেই জানিত। মেলাও পূর্ব্বে প্রবল ছিল না। দু এক জন সন্ন্যাসী দণ্ডী

মাত্র এখানে আসিত। স্থানীয় লোকেরা ক্রমে বিশেষ তত্ত্ব জানিয়া, জঙ্গল কাটাইয়া পথ পরিষ্কার করাইয়া দুচার ঘর লোকের বাস বসাইয়াছে এবং এস্থানকে মনুষ্যসমাগমের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। এখনো কেবল বৈশাখ মাসেই এখানে লোকের সমাগম হইয়া থাকে। বৎসরের অন্যান্য সময় কেবল রাত্রিতে নয়, দিবাভাগেও কেহ বড় একটা এদিকে আসে না। রাত্রে কেবল বন্য জন্তুরই কোলাহল শ্রুত হইয়া থাকে। এখনো ভগ্ন পুরীর স্থানে স্থানে রাজপথ এবং কোন কোন স্থানে সরোবর প্রভৃতির চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু কালের কুটিল গতি। ক্রমশঃ সব লোপ পাইতেছে। রাজধানীর রাজপথ আজকাল "বাহ্যতে শিবাভিঃ"। যে দীর্ঘিকায় সুন্দরীরা জলক্রীড়া করিত, আজ মহিষগণ বিষাণাঘাতে তাহার আবদ্ধ সলিল সংক্ষুব্ধ করিতেছে। যে সোপানাবলীতে সুন্দরীগণের লাক্ষারসাদ্রচরণচিহ্ন অঙ্কিত হইত, আজ সেখানে ব্যাঘ্র-হতবন্য-জন্তুর শোণিতচিহ্নরাগ। যে উদ্যানলতার পেলব পল্লবগুলি আস্তে আস্তে নোয়াইয়া কোমল অঙ্গুলিচয় পুষ্পচয়ন করিত, আজ বানরে তাহা ছিন্নভিন্ন করিতেছে। রত্নমণিভাস্বর গবাক্ষতল আজ কৃমিতন্তুজালে আচ্ছাদিত। আর বেশী বলিলে কি হইবে। অতীত আর ফেরে না। সম্মুখে নূতন ভবিষ্যৎ যদি কিঞ্চিৎ আশাপ্রদ হয়, তাহাই যথেষ্ট। ভগবানের ইচ্ছায় পুরাতন পৃথিবী নবীন জগতে পরিণত হয়। পুরাতনের জন্য শোক করিয়া কি করিব? অপরিহার্য্য নূতনকে আমাদের আদর করিতেই হইবে। ভগবানের ইচ্ছায় আমরা যেন নূতন শক্তি পাইয়া নূতনকে ভালবাসিতে শিখি।

বিরাটের নিকটবর্ত্তী রাজাহার গ্রামে অনেক গুলি প্রস্তর-

নির্ম্মিত সুগঠন দেবমূর্ত্তি আছে। ঐগুলি কোথাও কোথাও টব অথবা অশ্বত্থমূলে গ্রাম্য দেবতা হইয়া গ্রামবাসিদের পূজাহ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটী বড় সুন্দর মূর্ত্তি দেখিলাম। হঠাৎ দেখিলে প্রথমে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু বাস্তবিক ইহা একটী হিন্দু দেবমূর্ত্তি, সম্ভবতঃ বাসুদেবমূর্ত্তি। শঙ্খচক্র গদাপদ্ম বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। কিন্তু পার্শ্বে অন্যান্য ক্ষুদ্র দেবমূর্ত্তি আছে। এমন হইতে পারে, বুদ্ধমূর্ত্তির অনুকরণে এইরূপ মূর্ত্তিগুলি গঠিত। প্রস্তরমূর্ত্তির নিম্নদেশে পাঁচটী অক্ষরে কিছু লেখা আছে। ঠিক পড়িতে পারিলাম না। সংস্কৃত অক্ষরই বোধ হয়, কিয়ৎ পরিমাণে অস্পষ্ট। ভবিষ্যতে ঠিক পাঠ উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিব। এই প্রস্তরাঙ্কিত লিপি খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হইতেছে। এইরূপ প্রাচীনতার নানা চিহ্ন দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, এখানে কোন এক সমৃদ্ধ রাজবংশের রাজধানী ছিল এবং এমনও হইতে পারে, প্রাচীন বিরাট নগরী এইখানে কিম্বা ইহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ছিল।

এক্ষণে মহাভারতের বিরাটপুরীর যেরূপ ভৌগোলিক স্থান নির্দ্দেশ আছে, তৎসম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। মহাভারতের বিরাটপর্ব্ব মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়, মৎস্যদেশ অথবা বিরাটাধিকৃত রাজ্য অতি বিস্তৃত জনপদ ছিল এবং বিরাট রাজা ও শ্যালক সেনাপতি কীচকের সাহায্যে একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেনাপতি কীচকই বারম্বার ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাকে পরাজয় করিয়াছিলেন। কীচকবধের পর এই ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাই বিরাট রাজাকে নিরাশ্রয় ও নিরুৎসাহ মনে করিয়া দুর্যোধন ও কর্ণ প্রভৃতিকে মৎস্যদেশ জয় করিতে মন্ত্রণা

প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারই উত্তেজনায় বড় বড় রথী মহারথী বিরাট রাজার গরু চুরী করিবার জন্য বাহিনী যোজনা করিয়া রণসাজে বাহির হইয়াছিলেন। দূরদুরান্তে নানা স্থানে বিরাটের সহস্র সহস্র গোধন ছিল। তাঁহার সহস্র সহস্র অশ্ব-মাতঙ্গাদিও ছিল। বিরাট জনপদ অতি সমৃদ্ধিশালী বলিয়াই কুরু মহাশয়েরা লোভ পরবশ হইয়া বিরাটকে অনুগৃহীত করিতে গিয়াছিলেন। রাজ্যের বর্ণনা পাঠ করিয়া বেশ বুঝা যায়, বিরাট-রাজ্য সেকালে খুব বিস্তৃত ছিল। বিরাটপুরী হস্তিনাপুর হইতে অনেকদূর, কিন্তু রাজরাজড়ারা যুদ্ধ করিবার জন্য দূরদেশেই রণ-প্রয়াণ করিতেন। সেকালে চারিদিকে বিস্তৃত অরণ্যানী ছিল। এই সকল অরণ্যের ভিতর দিয়া যুদ্ধাভিযান চলিত। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রের সময়ও রাজারা বহুদূরদেশে মৃগয়া করিতেন এবং যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতেন। তিনি ত স্বয়ং ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমা অতি-ক্রম করিয়া সমুদ্র পার হইয়া স্বর্ণপুরী লঙ্কায় উপনীত হইয়াছিলেন।

এক্ষণে এই বিরাটপর্ব্বে বিস্তৃত মৎস্য জনপদের কিরূপ ভৌগোলিক স্থান নির্দ্দেশ আছে, দেখা যাউক। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা দ্বাদশবৎসর অরণ্যবাস করিয়া প্রতিজ্ঞানুসারে ত্রয়োদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসে কাটাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা আপনাদের মধ্যে পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কোন্ স্থান অজ্ঞাত-বাসের উপযুক্ত হইবে। অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে কয়েকটী বাসোপযোগী রমণীয় গূঢ়তম স্থানের উল্লেখ করিলেন। তিনি কুরুমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, শূরসেন, পটচ্চর, দশার্ণ, নবরাষ্ট্র, মল্ল, শাল, যুগন্ধর, বিশাল, কুন্তিরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র ও অবন্তী এই কয়েকটী জনপদের উল্লেখ করিলেন। এই জনপদ গুলি যে ঠিক কুরুমণ্ডলের অতি সন্নিহিত, তাহা নয়, অনেকগুলি

জনপদ বহু দূরে। যুধিষ্ঠির বিরাট রাজার দেশই পছন্দ করিলেন। ইহাই অতি সম্ভবপর যে, যে দেশ বহুদূরবর্ত্তী এবং অজ্ঞাতবাসের উপযুক্ত, যুধিষ্ঠির তাহাই ঠিক করিলেন। বিরাটরাজ্য যে বেশ দূরবর্ত্তী, তাহা এই বিরাটপর্ব্ব হইতেই বেশ বুঝা যাইবে। কারণ পঞ্চ পাণ্ডবের বিরাট গমনের পথ সংক্ষেপে বেশ স্পষ্টভাবে লিখিত আছে।

বিরাটপর্ব্বের পঞ্চম অধ্যায়ে এই পথের বৃত্তান্ত আছে। বর্ণনা এইরূপ; "যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা ধনুঃ খড়্গ আয়ুধ তূণ প্রভৃতি গ্রহণ পূর্ব্বক পাদচারে কালিন্দী নদীর দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইলেন, তথা হইতে কখন বা গিরিদুর্গ, কখন বা বনদুর্গে অবস্থান করিয়া মৃগয়া করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দশার্ণ দেশের উত্তর, পঞ্চাল দেশের দক্ষিণ এবং যকৃল্লোম ও শূর সেনের মধ্য দিয়া মৎস্যদেশে প্রবিষ্ট হইলেন।" এই বর্ণনা অতি পরিষ্কার; কোন ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। মৎস্যদেশের প্রান্তভাগ হইতে বিরাটের রাজধানীও বহুদূর। দ্রুপদনন্দিনী রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন "নানাবিধ ক্ষেত্র ও পথ সমুদয়ের অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, মৎস্যরাজের রাজধানী অতিদূরবর্ত্তী হইবে। আমিও সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছি, অতএব এই রাত্রি এই স্থানেই অবস্থান করুন"। তার পর যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে দেখা যাউক, উপরিধৃত বর্ণনায় যে সকল জনপদের নাম আছে সেগুলি কোথায়। আর একটী কথা বলা আবশ্যক। যুধিষ্ঠিরাদি প্রথমে দ্বৈতবন কাম্যকবন প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে-ছিলেন। তাঁহারা বনাভ্যন্তর দিয়াই চলিতেছিলেন, কারণ তাঁহা-দিগকে যেন কেহ দেখিতে না পায়। এই জন্য তাঁহাদের 'গার-

দুর্গে' অথবা 'বনদুর্গে' বাস করিতে হইয়াছিল। এই জন্য ইহা বুঝা উচিত নয় যে, মৎস্যদেশের প্রান্তভাগ ঠিক উপরিউক্ত চারি জনপদের একটীর অতি সন্নিহিত। তাঁহারা অনেক অরণ্য এবং হয়ত অন্যান্য জনপদের প্রান্তভাগ দিয়া গিয়াছিলেন; প্রধান কয়েকটী জনপদের মাত্র উল্লেখ আছে। প্রথমে তাঁহারা কালিন্দীর তীরে উপনীত হইলেন। কালিন্দী যে যমুনা, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহার পর দশার্ণদেশের উত্তর দিক দিয়া তাঁহারা চলিলেন। এই দশার্ণদেশ মেঘদূতের "শ্যামজম্বুবনান্তা দশার্ণাঃ"। ইহাও এক বিস্তৃত জনপদ এবং বিদিশা ইহার রাজধানী। মেঘদূতেও আছে "বিদিশালক্ষণা রাজধানী" এবং বেত্রবতীর তীরে এই বিদিশা। ইহা হইতে বুঝা যায়, যুধিষ্ঠিরেরা বর্ত্তমান এলাহাবাদের কোন স্থান দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর পাঞ্চালদেশের দক্ষিণ দিক্ দিয়া তাঁহারা চলিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বদিক্ অভিমুখে চলিয়াছেন, অথবা দক্ষিণ পূর্ব্বভাগ দিকে যাইতেছেন, একথার প্রমাণ পরে আছে। এই পাঞ্চালও এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ। মহাভারতে পাঞ্চাল দেশের যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, পাঞ্চালদেশের মধ্যে ভাগীরথী প্রবাহিত এবং উত্তর পাঞ্চাল এবং দক্ষিণ পাঞ্চাল নামে ইহার দুই অংশ আছে। বর্ত্তমান কালের গোরখপুর পর্য্যন্ত পাঞ্চালদেশ বিস্তৃত ছিল। তাহা হইলেও বিশেষ বুঝা যায় না। পাণ্ডবেরা পূর্ব্বদিকে বা দক্ষিণদিকে যাইতেছেন, ইহা মনে করিলে, বুঝিতে হইবে, তাঁহারা এলাহাবাদের অনেক পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর যকৃল্লোম ও শূরসেন দেশ। যকৃল্লোমের বিশেষ বিবরণ পাওয়া কঠিন, তারপর শূরসেন দেশ লইয়া বিশেষ গোল। রঘুবংশে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর বর্ণনায় শূরসেন দেশের উল্লেখ আছে।

"পুংবৎপ্রগল্‌ভা প্রতীহাররক্ষী" সুনন্দা ইন্দুমতীর কাছে শূরসেনাধিপতি সুষেণের গুণ বর্ণনা করিলেন। তাহার এক জায়গায় আছে "কলিঙ্গ-কন্যা মথুরাং গতাপি, গঙ্গোর্ম্মিসংসক্তজলেব ভাতি।" তাহা হইলে শূরসেন জনপদের রাজধানী হইতেছে মথুরা। এই মথুরা নগরী লবণাসুর বধের পর শত্রুঘ্ন নির্ম্মিত পুরী। মল্লিনাথ একটু Anachronism দোষ দেখাইয়া বলিতেছেন, হয়ত এ অন্য মথুরা। বাস্তবিক অনেক সময় এক নামের দুই দেশ থাকাতে বড় গোলমাল হয়। কালিদাসোক্ত শূরসেন দেশ বোধ হয় বিরাটপর্ব্বের শূরসেন দেশ নয়, তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরাদিকে পূর্ব্বদেশে যাইতে যাইতে আবার পশ্চিমে ফিরিয়া হস্তিনার দিকে যাইতে হয়। তাহা সম্ভবপর নয়। এই শূরসেন দেশ মগধের কোন অংশ বিশেষ বলিয়া বোধ হয়। বরাবর পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া চারিটি বিস্তৃত জনপদ অতিক্রম করিলে মগধের ন্যায় কোন স্থানে আসিয়া পড়িতে হয়। মগধও অতি বিস্তৃত রাজ্য। ইহার পূর্ব্বে উত্তরবাঙ্গালা। জঙ্গল অতিক্রম করিয়া আসিলে এই উত্তর-বাঙ্গালায় পঁহুছিতে পারা যায়। পাঁণ্ডবেরা যে দক্ষিণ পূর্ব্বদেশে আসিয়াছিলেন, তাহার অকাট্য প্রমাণ, বিরাটপর্ব্বের ত্রিংশত্তম অধ্যায়ে আছে। এই অধ্যায়ের এক জায়গায় আছে "অনন্তর সুশর্ম্মা বদ্ধপরিকর হইয়া মহতীসেনা-সমভিব্যাহারে গোধন অপহরণ ও বৈরনির্য্যাতন মানসে কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে অগ্নিকোণাভিমুখে যাত্রা করিলেন"। অগ্নিকোণ পূর্ব্বদক্ষিণ-কোণ। যদিও জনপদগুলির ঠিক তৎকালীয় স্থান নির্দ্দেশ করা কঠিন, তথাপি এই দিঙ্‌নির্দ্দেশের দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে, মৎস্যদেশে কুরুমণ্ডলের বহুদূরবর্ত্তী এবং অগ্নিকোণে অবস্থিত। ইহা ব্যতীত মহাভারতের আর

এক জায়গার আছে যে, মৎস্যদেশ কুরুরাজ্য হইতে বহু দূরস্থিত একটী পূর্ব্বদেশ। রাজসূয়যজ্ঞের পূর্ব্বে পাণ্ডবেরা দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন। ভীমসেন পূর্ব্বদিকের সমস্ত রাজা জয় করিয়াছিলেন। তিনি দশার্ণ, চেদি, কোশল ও কাশীরাজকে নির্জিত করিয়াছিলেন এবং পরে মৎস্য এবং পণ্ডভূমি জয় করিয়াছিলেন। তিনি বিদেহ, গিরিব্রজ, কর্ণের অঙ্গদেশ, পুণ্ড্রদেশ এবং কৌশিকীকচ্ছ জয় করিয়াছিলেন। এ সমস্তই বর্ত্তমান বাঙ্গলায় অবস্থিত। ভীমসেন আরো পূর্ব্বে গিয়াছিলেন; তিনি তাম্রলিপ্ত (তমলুক) এবং অন্যান্য বঙ্গদেশাধীশ্বরদিগকে এবং মহাসাগরকুল-বাসী ম্লেচ্ছগণকেও পরাজয় করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বেশ প্রমাণিত হইতেছে যে, মৎস্যদেশ মগধসন্নিহিত কোন একটী পূর্ব্বদেশ, বোধ হয়, পূর্ব্বে মৎস্য নামে অনেকগুলি জনপদ ছিল। যেখানে ধীবর জাতীয় লোকেরা বাস করিত, তাহাদের রাজাকেও মৎস্যরাজ বলা হইত। কুরুমণ্ডলের দক্ষিণেও এইরূপ এক মৎস্যরাজ্য ছিল। কিন্তু যাঁহার কন্যার সহিত অভিমন্যুর পরিণয় হয়, সেই মৎস্যরাজ পূর্ব্বদেশবাসী ছিলেন। ত্রিগর্ত্তরাজের সহিত মৎস্যরাজ্যের বহু যুদ্ধ হইয়াছিল। এই ত্রিগর্ত্তদেশ কোথায়, ইহার একটা মীমাংসা হইলেও বুঝা যাইত, মৎস্যদেশ ইহার কোন্ দিকে? কিন্তু তাহারও নির্দ্দেশ করা কঠিন। ১৩১০ সালের "প্রবাসী"র ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যায় "ত্রিগর্ত্তদেশ" নামে একটী প্রবন্ধ আছে। মনে করিয়াছিলাম, ইহাতে বুঝি কোনরূপ ভৌগোলিক স্থান নির্দ্দেশ আছে। কিন্তু পড়িয়া দেখিলাম ইহাতে কতকগুলি অর্থহীন বাজে গল্প এবং কাংড়া নামক স্থানের কথা আছে; ভৌগোলিক কথা কিছুই নাই। লেখক বলেন "ভারতোক্ত ত্রিগর্ত্তরাজ শূরসেনের রাজ্য

বর্ত্তমান কাংড়া জেলা বলিয়া প্রসিদ্ধ"। এ সকল কথা লেখক কোথা হইতে পাইলেন, তিনিই জানেন। তিনি ত্রিগর্ত্ত দেশটাকে কেন কামস্কটকায় লইয়া যান নাই, বলিতে পারি না। বরং যাঁহারা ত্রিগর্ত্তদেশকে "তিব্বত" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের কথায় কতকটা যুক্তি আছে। গঙ্গা, সিন্ধু এবং ব্রহ্মপুত্র, এই তিনটী নদ নদীর উৎপত্তি স্থান যেখানে আছে, তাহাকে বরং ত্রিগর্ত্তদেশ বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান ভূটান, সিকিম বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন জনপদ ও প্রাচীন ত্রিগর্ত্ত এক, ইহা বলিলেও কতকটা সামঞ্জস্য থাকে। স্বর্গীয় আনন্দরাম বড়ুয়া মহোদয় বর্ত্তমান পাতিয়ালাকে ত্রিগর্ত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; ইহাও ঠিক তাহা বলা যায় না। কুরুজনপদের বহুদূর পূর্ব্বে বাস করিয়া মৎস্যগণ কুরুমণ্ডলের উত্তর-পশ্চিম-দেশবাসী ত্রিগর্ত্তগণের সহিত সদা-সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতেন, একথা বড় বিশ্বাস্য নহে। মহাভারতের আর এক জায়গায় ত্রিগর্ত্তগণের একটু বিস্তৃত বিবরণ আছে। তাহা হইতে কতকটা বলা যায়, ত্রিগর্ত্তদেশ মৎস্যদেশের বড় বেশী দূর নয় এবং ত্রিগর্ত্তদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের একটা মীমাংসা করা যায়। ত্রিগর্ত্তদেশ আদৌ কুরুপ্রদেশের পশ্চিমে বা উত্তর-পশ্চিমে নয়। আশ্বমেধিক পর্ব্বে আছে, মহাবীর ধনঞ্জয় যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। অর্জ্জুন স্বেচ্ছাচারী অশ্বের অনুগমন করিয়া নানাদেশে উপনীত হইলেন এবং তত্তৎদেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া যজ্ঞীয় অশ্বের উদ্ধার সাধন করিলেন। আশ্বমেধিক পর্ব্বের ৭৩ অধ্যায়ে আছে "যজ্ঞীয় অশ্ব প্রথমতঃ উত্তর দিকে গমন করিয়া অসংখ্য রাজ্য বিমর্দ্দিত করিতে করিতে পূর্ব্বদিকে গমন করিল। মহাত্মা অর্জ্জুন ক্রমে ক্রমে তাহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে যে কত শত

নরপতি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইলেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এইরূপ সাধারণ বর্ণনার পর অর্জ্জুনের কয়েকটি বিশেষ দেশ জয়ের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে প্রথমেই ত্রিগর্ত্ত-দেশীয় রাজাদের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ আছে। ৭৪ অধ্যায়ে এই যুদ্ধের বর্ণনা। তৎকালীন ত্রিগর্ত্তরাজ সূর্য্যবর্ম্মা এবং তাঁহার ভ্রাতারা অর্জ্জুনের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া পরে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। ইহারই অব্যবহিত পরে যজ্ঞীয় অশ্ব প্রাগ্‌জ্যোতিষ্‌দেশে উপস্থিত হয় এবং সেখানে অর্জ্জুনের সহিত ভগদত্তপুত্র মহাবীর বজ্রদত্তের যুদ্ধ হয়। এই প্রাগ্‌-জ্যোতিষ্‌পুর বর্ত্তমান আসাম দেশ। ভগদত্তের হস্তী ছিল। বজ্রদত্তও হস্তিপৃষ্ঠে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করেন। এই আসাম প্রদেশই হস্তিসঙ্কুল। এক্ষণে বেশ প্রমাণ হইতেছে, আসামের অব্যব-হিতপশ্চিম প্রদেশই ত্রিগর্ত্তদেশ। যজ্ঞীয় অশ্ব প্রথমে উত্তরে পরে পূর্ব্বদিকে গমন করিয়াছিল। আসামই সর্ব্ব পূর্ব্বদেশ। তাহার পশ্চিমই ত্রিগর্ত্তদেশ। তাহা হইলেই ত্রিগর্ত্তদেশ কতকটা উত্তর বাংলার অংশ এবং বাংলা এবং হিমাচলের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ। হয়ত মগধের উত্তরপূর্ব্বাংশও এই ত্রিগর্ত্তদেশের অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে বেশ সহজে বুঝা যাইতে পারে যে, ত্রিগর্ত্তদের সহিত মৎস্য-দেশবাসিদের সদাসর্ব্বদা সংগ্রাম হইত। এতকাল পরে বহুশতাব্দী পূর্ব্বের অতীত ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক বৃত্তান্তের সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার। কিয়ৎ পরিমাণে উপযুক্ত প্রমাণের সহিত অনেকাংশ অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহার ফল এই হয়, একটী মত হইতে আর একটী মত আকাশ পাতাল বিভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। মৎস্যদেশের ও ত্রিগর্ত্ত-দেশের প্রকৃত ভৌগোলিক অবস্থা সম্বন্ধেও এই কথা প্রযুজ্য। কিন্তু

এই সকল দেশ যে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে অনেক দূরে ছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। অঙ্গাধিপতি কর্ণবীর যেমন বহুদূর হইতে দুর্য্যোধনের সভায় উপস্থিত থাকিতেন, মৎস্যরাজ, ত্রিগর্ত্তরাজ প্রভৃতিও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে হস্তিনাপুরীতে উপস্থিত হইতেন।

এই বিরাটের মেলাস্থানে প্রাচীন বিরাট রাজধানী ছিল কিনা, ঠিক করিয়া বলা বড় দুরূহ ব্যাপার। যাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণ প্রমাণ এবং নিজেদের অনুমান এবং বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া এইস্থানে বিরাটের স্মৃতিরক্ষার্থ মেলা স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা যে বড় ভুল করিয়াছেন, ইহা বোধ হয় না। বহুসহস্র বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং প্রমাণ চিহ্নগুলিও সব বিলুপ্তপ্রায়। তথাপি মহাভারতের বর্ণনার উপর নির্ভর করিলে অনেকটা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, উত্তর বাংলায় এবং ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে মৎস্যজনপদ এবং বিরাটরাজধানী ছিল। বিরাটের বর্ত্তমান মেলাটী কিয়ৎপরিমাণে ঐতিহাসিক সত্য রক্ষা করিতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্যান্য মেলার সহিত এই বিরাট মেলার বিশেষ প্রভেদ এই, এখানে কোন দেবতার পূজা উপলক্ষে অথবা দেবতার লীলা স্মরণ করিয়া এ মেলা হয় না; একটী সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি জন্যই এই মেলার সৃষ্টি।

মহর্ষি কণ্ব।

মহর্ষিকণ্ব "শকুন্তলের" একটি মহান্ অত্যুৎকৃষ্ট চিত্র। যেমন এক দিকে মহারাজ দুষ্যন্ত ভারতবর্ষের একজন উন্নতচরিত্র শ্রেষ্ঠ রাজা এবং নাটকের নায়ক, অপর দিকে সেইরূপ ভগবান্ কণ্ব অন্যান্য নাটকীয় চরিত্রের মধ্যে এক বিশাল বিরাটমূর্ত্তি। দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার মিলন ও বিবাহ এবং তাহাদের বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন লইয়া এই নাটক। বরপক্ষে স্বয়ং দুষ্যন্তই এক অদ্বিতীয় প্রভাববান্ পুরুষ; কন্যাপক্ষে তদ্রূপ মহর্ষি কণ্বও এক আদর্শ-স্থানীয় মহাপুরুষ।

নাটকীয় ঘটনাবলীর মধ্যে কেবল একবার মাত্র আমরা মহর্ষি কণ্বকে দেখিতে পাই। চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলার পতিগৃহ-গমনের সময় মহর্ষি সশরীরে আমাদের দর্শনগোচর হইয়াছেন। এই অত্যল্প সময়ের জন্য দেখিয়াও আমরা তাঁহার বিরাট অস্তিত্বের অনুভব করি; এবং আশ্রমের কুলপতি মহর্ষি কাহাকে বলে তাহা বেশ বুঝিতে পারি। নাটকের অন্যান্য অঙ্কোক্ত ঘটনাবলীতেও তাঁহার অলক্ষিত প্রভাব দেখিতে পাই। তিনি অশরীরিণী বাণীর ন্যায় অতি প্রভাবযুক্ত। মনে হয় যেন প্রত্যেক ঘটনাতেই প্রত্যেক সৎকার্য্যে তিনি অলক্ষিত ভাবে থাকিয়া সাহায্য করিতেছেন। শকুন্তলার গান্ধর্ব্ব বিবাহের সময় তিনি আশ্রমে ছিলেন না; কিন্তু মনে হয় যেন মহর্ষি অলক্ষিতে থাকিয়া এই বিবাহের অনুমোদন করিলেন। রাজা দুষ্যন্ত যখন প্রথমে আশ্রমে প্রবেশ করেন, তখন সারথিকে বলিলেন, "সূত, বিনীতবেশেন প্রবেষ্টব্যানি তপোবনানি নাম" এবং আভরণ ও ধনুঃ প্রভৃতি সারথিকে অর্পণ করিলেন।

তপোবনবাসিদের পাছে ক্লেশ হয় এই জন্য দূরে রথরক্ষা করিলেন। ইহাও মহর্ষি কণ্বের অলক্ষিত প্রভাব।

ভগবান্ কণ্ব তপস্বী। তপস্যাই তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। এই তপস্যা কি তাহা বিস্তারিত বুঝা বড় কঠিন। তবে এইটুকু বুঝা যায় যে ভগবৎপ্রীতি এবং ঈশ্বরাভিপ্রেত কর্ম্ম করাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য এবং সর্ব্বদা তিনি ঈশ্বরসান্নিধ্যলাভ করিবার জন্য অতিব্যস্ত। শকুন্তলাকে বিদায় দিবার সময় মহর্ষি বলিতেছেন, "বৎসে, উপরুধ্যতে তপোঽনুষ্ঠানম্"। শকুন্তলাও পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন 'তপশ্চরণপীড়িতং তাতশরীরং। তদলং অতিমাত্রং মমকৃতে উৎকণ্ঠ্য"।

এই মহামুনির তপস্যার স্থান মালিনীতীরের আশ্রম। কালিদাস অতি যত্নের সহিত নাটকের স্থানে স্থানে এই আশ্রমের বর্ণনা করিয়াছেন। এমন আশ্রম যেন জগতে আর কোথায়ও ছিল না। কণ্বমুনি এই আশ্রমের কুলপতি বা রাজা। যেমন দুষ্যন্ত, সংসারের—হস্তিনাপুরের—রাজা, মহর্ষি সেইরূপ এই আশ্রমের সর্ব্বময় অধিপতি। রাজা অপেক্ষা মহর্ষি কত বড়, তাহা, এই আশ্রম কি, ইহা ভাল করিয়া বুঝিলে বুঝা যাইবে। এই আশ্রমবাসী মানুষ ও এই আশ্রমস্থিত তরুলতা পশুপক্ষী প্রভৃতির প্রকৃতি ভাল করিয়া বুঝিলেই বুঝা যাইবে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ রামায়ণ মহাভারতাদিতে নানা মুনির নানা আশ্রমের বর্ণনা আছে। কিন্তু কালিদাস যেমন তন্ন তন্ন করিয়া এই মালিনী তীরের আশ্রমের শান্তিপূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন, এরূপ আর কেহ কোথায়ও দেখান নাই। মরু ভূমির মধ্যে যেমন Oasis (ফল পুষ্পসলিলাদিপূর্ণ শ্যামলক্ষেত্র), এই সুখ-দুঃখময়, পাপ-পুণ্যময় সংসারের মধ্যে তেমনি মুনিদিগের আশ্রমভূমি। আর এই

মহর্ষি কণ্বের আশ্রম অন্যান্য সকল আশ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কালিদাসের মনে এই আশ্রমের কবিত্বময় সৌন্দর্য্য চিরবদ্ধমূল ছিল। তিনি তাঁহার প্রত্যেক কাব্যেই যেখানে অবসর পাইয়াছেন সেই খানেই আশ্রমবর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন। আশ্রমভূমি যেন ইহলোকে স্বর্গ—"দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্"।

"অভিজ্ঞানশকুন্তলে" দুটি আশ্রম বা তপোবনের বর্ণনা আছে। একটি ভগবান্ কণ্বের পবিত্র মালিনীতীরস্থ আশ্রম, অপরটি সুরাসুরগুরু ভগবান্ কশ্যপের হেমকূটপর্ব্বতস্থ পুণ্য তপস্যাভূমি। এই উভয়ের মধ্যেও কবি অনেক পার্থক্য দেখাইয়াছেন। প্রথম আশ্রমটি কবিতাময়, পরমসৌন্দর্য্যময়, শান্তিময়, পবিত্র মুনিগণের আবাসভূমি। দ্বিতীয়টি দেবভাবাপন্ন, অলৌকিকত্বসম্পন্ন, কঠোর তপস্যার লীলাভূমি। কবি কণ্বাশ্রমের প্রতি একটু অত্যাদর দেখাইছেন। তাহার কারণ মহর্ষি কণ্ব মানুষ এবং ঋষি এবং ভগবান্ কশ্যপ দেবতা এবং ঋষি। মহর্ষি কণ্ব মানুষের আদর্শ (Ideal); ভগবান্ কশ্যপ সর্ব্বতোভাবে অলৌকিকপ্রভাবযুক্ত দেবতাবিশেষ। কশ্যপাশ্রমের বর্ণনা অতিশয় সংক্ষিপ্ত; মালিনীতীরের আশ্রম মহাকবি একটু বিস্তৃতভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার কারণ মহর্ষি কণ্ব নাটকের একজন Central character (শ্রেষ্ঠচরিত্র)। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে তাঁহার আশ্রম ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। এই আশ্রমের ছবি অতি অপূর্ব্ব। কোথাও শুকপক্ষীর আবাসস্থান বৃক্ষকোটর হইতে ভ্রষ্ট নীবার ধান্যগুলি বৃক্ষের তলদেশে পতিত রহিয়াছে। কোন স্থানে মুনিরা প্রস্তরের উপর ইঙ্গুলীফল ভাঙ্গিয়াছেন বলিয়া প্রস্তরখণ্ডগুলি 'স্নেহলিপ্ত' রহিয়াছে। মৃগেরা নবোদ্গত কুশাঙ্কুর ভক্ষণ করিয়া নির্ভয়ে চারিদিকে বিচরণ করিতেছে। আরণ্যগজ

প্রভৃতি ভয়াবহ জন্তু সকল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলেও কাহাকেও হিংস করে না। কোথাও অবগাহনান্তে মুনিদের পরিধেয় বল্কল প্রান্ত হইতে জলধারা বিগলিত হওয়াতে জলাশয়ের পথগুলি আর্দ্র হইয়া রহিয়াছে। কোথাও বা আহুতঘৃতোৎপন্ন-ধূমোদ্গমে বৃক্ষ-লতাদির নবপল্লবপত্রাদি মলিন হইয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে তাপসবালিকারা স্বপ্রমাণানুরূপ সেচনকলস লইয়া ছোট ছোট গাছগুলিতে জল দিতেছেন। বৃক্ষলতাদির উপর বালিকাদের ভ্রাতৃভাব ও ভগিনীভাব; এবং হরিণশিশুর প্রতি তাঁহাদের পুত্র-বাৎসল্য। শকুন্তলের আলবাল পূরণে নিযুক্ত তিনটি সখীর ভুবনমোহন ছবি আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল রহিয়াছে। স্বয়ং কবিও এই অপূর্ব্বসৌন্দর্য্যময় ছবি ভুলিতে পারেন নাই। অন্যান্য স্থানে আশ্রমবর্ণনার সময় অজ্ঞাতসারে এই ছবিই পুনরঙ্কিত করিয়াছেন। রঘুবংশে বশিষ্ঠাশ্রমের বর্ণনায় আছে ;—

"সেকান্তে মুনিকন্যাভিস্তৎক্ষণোজ্ঝিতবৃক্ষকম্।
বিশ্বাসায় বিহঙ্গানাং আলবালাম্বুপায়িনাং ॥"

এখানে এই মুনিকন্যারা আর কেহ নন; ইঁহারা শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা। এই তাপসবালিকারা কোথাও আবার নবকুসুমযৌবনা লতিকার সহিত সহকারাদি পাদপের উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পাদন করাইয়া সস্নেহ-দৃষ্টিতে আগ্রহের সহিত দেখিতে-ছেন। আবার কোনখানে পুত্রীকৃতমৃগশাবককে নবীনতৃণ ভোজন করাইয়া কৃতার্থা মনে করিতেছেন। ফলমূলাদি অর্ঘ্য দ্বারা অতিথির সেবা, পূজার জন্য পুষ্পাদি আহরণ প্রভৃতি কাজই আশ্রমবাসিদের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম। দরিদ্র ঋষিদের পরিধেয় বল্কল স্নানের পর বৃক্ষশাখায় বিলম্বিত হইয়া শুষ্কতাপ্রাপ্ত হয়; ইঙ্গুদী-ফলের তৈলে তাঁহারা মস্তকের রুক্ষভাব দূর করেন।

নলিনীপত্রসঞ্চালনে তাঁহারা গ্রীষ্মের তাপ দূর করেন; আবশ্যক হইলে দেহসন্তাপনিবারণের জন্য উশীর লেপন করিয়া থাকেন। ঋষিরমণীরা মৃণালবলয়ে ও কুসুমহারেই দেবতাবৎ অলঙ্কৃতা। এইরূপ সরলভাবে জীবনধারণ করিয়াও আশ্রমবাসিরা মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল। মুনিশিষ্যেরা পরম-পণ্ডিত এবং বহুশাস্ত্রবিৎ। শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত তপোবলসম্পন্ন বিদ্বান্ ঋষি এবং তাঁহারা লোকচরিত্রজ্ঞ। বেদি-আচ্ছাদন জন্য যে শিষ্যটি কুশসংগ্রহ করিয়াছেন তিনিও রাজা দুষ্যন্তের চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন এবং তিনিই শকুন্তলাকে "কণ্বস্য কুলপতে-রুচ্ছসিতম্" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যে শিষ্যটি হোমবেলা ঠিক করিতেছেন তিনিও গম্ভীর দার্শনিকের ন্যায় বলিতেছেন;

> "যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্
> আবিষ্কৃতোঽরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।
> তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং
> লোকো নিয়ম্যত ইবাত্মদশান্তরেষু॥
>
> অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতী মে
> দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয়শোভা।
> ইষ্টপ্রবাসজনিতান্যবলাজনস্য
> দুঃখানি নূনমতিমাত্রসুদুঃসহানি॥"

তাপসবালিকারাও সুশিক্ষিতা এবং ইতিহাসাদিনানাশাস্ত্রজ্ঞ। অনসূয়া সযত্নশিক্ষিতা বুদ্ধিমতী তাপসবালা। সংক্ষেপে বলা যায়;—এই আশ্রমভূমি Plain living and high thinkingএর অতি প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। কালিদাস প্রায় তাঁহার প্রত্যেক কাব্যেই নানাস্থানে আশ্রমবর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন। রঘু-বংশে ভগবান্ বশিষ্ঠমুনির আশ্রমের কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বর্ণনা

করিয়াছেন। "রঘু"র অন্যান্য স্থানে বিশ্বামিত্রাশ্রম, বামনাশ্রম, অত্রিমুনির তপোবন, অগস্ত্যাশ্রম এবং গৌতমাশ্রম প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। "কুমারে" ভগবান স্থাণুদেবের আশ্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এইরূপ "বিক্রমোর্ব্বশী" এবং "মেঘদূতে"ও আশ্রমের বর্ণনা আছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম বর্ণনা এই মালিনীতীরস্থ আশ্রমের। তাহার কারণ তিনি মহর্ষি কণ্বকে অত্যুন্নতচরিত মহাপুরুষ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার "উচ্ছসিত" শকুন্তলা এই আশ্রমের ললামভূতা। মহর্ষি এই আশ্রমের কুলপতি বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠমুনি। "কুলপতি"র একটা আভিধানিক সংজ্ঞা আছে ;

"মুনীনাং দশসাহস্রং যোঽন্নদানাদিপোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিরসৌ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥'

প্রত্যেক কুলপতিরই যে দশ সহস্র মুনির অধিনায়ক হইতে হইবে এমন বোধ হয় না। তাহা হইলে আশ্রমের পরিমাণ অতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এমন হইতে পারে যে ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমেরও একজন অধিনেতা থাকিতে পারে। অভিধানিক অর্থ হইতে এইটুকু বেশ বুঝা যায় যে কুলপতি একজন অতি শ্রেষ্ঠ মহামুনি এবং তাঁহাদের সংখ্যা বড় কম। অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুনিরাও * কুলপতির অধীনে একই আশ্রমে বাস করিতেন। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমেও দেখা যায় অন্যান্য মুনিরা সশিষ্য বাস করিতেন। রাজার প্রথম মৃগয়ার সময় সশিষ্য বৈখানস মৃগবধ হইতে তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি কণ্ব এরূপ

---

* বর্ত্তমান "টোল"প্রথা কুলপতিদের শিষ্যপোষণ প্রথা হইতে উদ্ভূত হইতে পারে।

ব্যক্তিরও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু। এই বিস্তান্বিত আশ্রম বর্ণনা হইতে বেশ বুঝা যায় মহর্ষি কণ্ব এই আশ্রমের আধ্যাত্মিক রাজা।

এক্ষণে বুঝিয়া দেখিতে হইবে মনুষ্যত্বের হিসাবে তিনি কিরূপ চরিত্রের মানুষ। এই আধ্যাত্মিক রাজার প্রিয়তমা কন্যার সহিত তৎকালিক ভারতবর্ষের রাজচক্রবর্ত্তী দুষ্যন্তের শুভ-পরিণয় হইয়াছিল। যোগ্যে যোগ্যে মিলন হইয়াছিল কি না বুঝিবার জন্য মহর্ষি কণ্বের চরিত্র বিশেষরূপে অনুধাবনীয়।

শকুন্তলা মহর্ষির ঔরসজাতা কন্যা নহেন, তাঁহার পালিতা কন্যা। কিন্তু এ কথাটা ভুলিয়া গেলেই ভাল হয়। মহাভারতে এইরূপ আছে বলিয়া ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বোধ হয় মহাকবি মহাভারত অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু নাটকে কণ্ব ও শকুন্তলা সম্বন্ধে এমন কোন কথা নাই যাহা হইতে বুঝা যাইতে পারে যে শকুন্তলা তাঁহার পালিতা কন্যা। কাজেই বলিতেছিলাম পাঠকের পক্ষে এ কথাটা ভুলিয়া গেলেই ভাল হয়। মহাভারতের পালিতসম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিবার আরো কিছু কারণ আছে। এক কথা এই, পালিত এবং ক্ষত্রিয়বর্ণ না হইলে দুষ্যন্তের সহিত শকুন্তলার পরিণয় হয় না। কিন্তু ইহা ছাড়া প্রকৃত কারণ আর একটি আছে। ইহাতে মহর্ষি চরিত্রের বড় পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। তিনি শাশ্বতব্রহ্মচর্য্যেস্থিত অথচ প্রত্যেক প্রাণি, প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থেই তাঁহার পরিপূর্ণ মানবীয় ভাব (human interest)। এইজন্য মহর্ষিকে ব্রহ্মচারী না করিলে এই ভাব সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয় না। এই জন্যই এখানে প্রতিভাশালী মহাকবির কাব্যকৌশল। কবি ইচ্ছা করিলেই মহর্ষিকে অন্যান্য ঋষিদের ন্যায় বিবাহিত বলিয়া এবং শকুন্তলার জন্মদাতা পিতা বলিয়া বর্ণনা করিতে পারিতেন।

কিন্তু তাহাতে নাটকের মহান্ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। মহর্ষির নিকট ঔরসজাত কন্যা এবং পালিতা কন্যার প্রভেদ নাই। অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদাও তাঁহার কন্যা নহেন। কিন্তু তাঁহাদেরও তিনি ঔরসকন্যার ন্যায় সমান আদর করেন। শকুন্তলাকে বিদায় দিবার সময় তাঁহাকে তাঁহার সখীদ্বয়সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন; "বৎসে, ইমে অপি প্রদেয়ে।" মহর্ষি পূর্ণ সমদর্শী।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি নাটকে মহর্ষির সশরীর দর্শন অতি অল্পই আমরা পাই। প্রথম চারি অঙ্কের ঘটনাস্থান আশ্রম। কিন্তু প্রথম তিন অঙ্কেই কণ্বমুনি অনুপস্থিত। চতুর্থ অঙ্কের কতক দূর অগ্রসর হইলে তবে আমরা মহর্ষির প্রথম দর্শন পাই। প্রথম তিন অঙ্কের ঘটনার সময় তিনি সোমতীর্থে ছিলেন। তিনি দুহিতা শকুন্তলাকে অতিথি সৎকার কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া শকুন্তলারই প্রতিকূল দৈবের শান্তির জন্য সোমতীর্থে গিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র ঘটনায় আমরা মহর্ষির উচ্চশ্রেণীর মানবিকতা ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতা দেখিতে পাই। মহর্ষি শাশ্বতব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী হইয়াও শকুন্তলাকে দুহিতা পাইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে নিজেরই দুহিতা করিয়া লইয়াছেন। মহর্ষির এক শিষ্যের মুখেই এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে; "শকুন্তলা কণ্বস্য কুলপতেরুচ্ছ্বসিতম্"। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রত্যেক পাঠকেরই ভুলিয়া যাওয়া উচিত, যে শকুন্তলা মহর্ষির পালিতা কন্যা। তিনি শকুন্তলার জন্য যাহা যাহা করিয়াছেন তাহা পূর্ণতাপ্রাপ্ত আদর্শ মানুষের—আদর্শ পিতার—নিজের কন্যার জন্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কন্যাকে পালন করিতে হইবে এবং উপযুক্ত শিক্ষা হইবে। এই সোমতীর্থগমনই কন্যা পালনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

একালের লোকেরা অনেকে প্রতিকূল দৈব মানেন না। কিন্তু

সে কালের লোকেরা মানিতেন। ইহার কিছু কারণও আছে। এমন কতকগুলি ঘটনা আছে যাহার উপর মানুষের কোন হাত নাই। সেগুলি ভবিষ্যতে প্রতিকূল হইবে এরূপ বুঝিলে, মানুষ অক্ষম হইলেও তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করে। যেখানে সহজ উপায়ে হয় না সেখানে ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়া তাহার উপশম করিবার চেষ্টা করে। রোগ হইলে যেমন চিকিৎসকের দরকার, ভাবি বিপদের আশঙ্কা হইলে তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করা মানুষের কর্ত্তব্য। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহার প্রভাবে প্রতিকূল দৈবের উপশম হইতে পারে। এই জন্য মহর্ষি স্বীয় কন্যার ভাবিবিপদাশঙ্কা করিয়া সোমতীর্থে কোনরূপ ঐশ্বরিক ব্যাপারে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যাঁহাদের মনোবৃত্তিগুলি স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে ভবিষ্যৎ দেখিতে পান এবং ভাবি-বিপদের প্রতীকারের জন্য কোথায় গেলে কি করিলে ফললাভ হইবে তাহাও বুঝিতে পারেন। ইহারই জন্য কণ্বমুনির সোমতীর্থে গমন। যাঁহারা এইরূপ দৈবশক্তি মানেন না তাঁহারা অন্ততঃ এইটুকু মানিবেন যে আত্মীয়গণের শুভকামনা করিয়া সর্ব্বদাই ভগবানের কাছে বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করা যায়। এবং এই ঘটনা হইতে ইহাও বুঝা যায় মহর্ষি কন্যাকে কত আদর করিতেন এবং তাঁহার জন্য কি না করিতেন। তপস্যা মহর্ষির জীবনের ব্রত। কিন্তু তিনি কন্যার জন্য একটা সাংসারিক ব্যাপারে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মচারী, তাঁহার এত ঝঞ্চাট কেন? ইহার উত্তর মহর্ষিকণ্ব তপস্যানিরত ঋষি এবং মানুষ। মানুষের উচ্চ কর্ত্তব্য তিনি ভুলেন নাই। পৃথিবীর লোকেদের উপকারের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই আত্মনিয়োগ কর্ত্তব্য একথা তিনি ভুলেন

নাই। তাই মহর্ষি সোমতীর্থে গিয়াছেন। প্রত্যেক পিতারই কর্ত্তব্য পুত্র-কন্যার শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করা এবং তাহাদের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা যত্নবান্ হওয়া। কর্ত্তব্য বলিয়া ইহা করা উচিত; ইহা কামনাযুক্ত কাজ নহে। ভগবদারাধনার জন্য মহর্ষি সোমতীর্থে গিয়াছিলেন। কর্ত্তব্যপালনের জন্য এই আরাধনা। ইহাও নিষ্কাম।

সোমতীর্থে হইতে ফিরিয়া আসিবার পর, ভগবান্ কণ্বের যে কার্য্যকলাপ আমরা দেখিতে পাই, তাহা তাঁহার ন্যায় মহর্ষির উপযুক্ত এবং তাঁহার উচ্চশ্রেণীর মহত্ত্বের পরিচায়ক। প্রিয়ংবদার মুখে আমরা আশ্রম-প্রত্যাগত মহর্ষির এই অনন্যসাধারণ মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক গুণের পরিচয় পাই। তিনি অগ্নিগৃহে প্রবিষ্ট হইতেছেন এমন সময়ে ছন্দোময়ী অশরীরিণী বাণী তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল :—

"দুষ্যন্তেনাহিতং তেজো দধানাং ভূতয়েভুবঃ।
অবেহি তনয়াং ব্রহ্মন্নগ্নিগর্ভাং শমীমিব॥"

তিনি দুষ্যন্ত শকুন্তলা ঘটিত বৃত্তান্ত সমস্তই অবগত হইলেন। নাট্যকৌশলের জন্য এই অশরীরিণী বাণীর প্রয়োজন। ব্যাপার খুব সংক্ষিপ্ত হইয়া গেল। গৌতমী অথবা অন্য কোন পূজনীয়া আশ্রম-রমণীর নিকটও তিনি এই বার্ত্তা পাইতেন। যাঁহারা অলৌকিকে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা এইরূপই মনে করিয়া লইতে পারেন। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া মহর্ষি কি করিলেন? অন্যলোক হইলে হয়ত এইরূপ সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইত; পিতার অধিকার লুপ্ত হইল মনে করিয়া হয়ত ক্রোধে অতিশয় অধীর হইয়া পড়িত। মহর্ষি কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে প্রকৃত অবস্থা বুঝিলেন। যাহা ঘটিয়াছে তাহা কেবল দুটি

বংশের মঙ্গলের জন্য নয়, পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য ঘটিয়াছে। "ভূতয়ে ভুবঃ" এই কথাটি মহর্ষির সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইল। বুদ্ধিমতী অনসূয়াও এই ব্যাপারটি ঠিক বুঝিয়াছিল। শকুন্তলার স্বয়ম্বর বিবাহ লইয়া অনসূয়াও প্রিয়ংবদার মধ্যে কথোপকথন হইতেছিল ঃ"

প্রিয়ংবদা—পিতা এক্ষণে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া না জানি কি করিবেন।

অনসূয়া—আমি যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় এই গান্ধর্ব্ব-বিবাহ তাঁহার অনুমত হইবে।

প্রিয়ংবদা—কিরূপে তাহা সম্ভব ?

অনসূয়া—গুণবান্ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে হইবে ইহাই কন্যার পিতার প্রধান সঙ্কল্প। যদি দৈবই তাহা সম্পাদন করেন তাহা হইলে বিনা আয়াসে গুরুজন কৃতার্থ হইলেন।"

মহর্ষি কণ্ব নিমেষের মধ্যে এই কথাই বুঝিয়াছিলেন। তাই অনসূয়ার মুখে এই কথা পূর্ব্বে সূচিত হইয়াছে। মহর্ষি পরমজ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ।

প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে সুখ-শয়ন বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া দেখিলেন তাত কাশ্যপ লজ্জাবনতমুখী শকুন্তলাকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দের সহিত বলিতেছেন, "বৎসে, সৌভাগ্যক্রমে ধূমাকুলিত দৃষ্টি যজমানের আহুতি অগ্নিতেই পড়িয়াছে। সুশিষ্যে প্রদত্ত বিদ্যার ন্যায় তোমার জন্য কোনরূপ দুঃখ করিবার কারণ নাই। অদ্যই ঋষিগণের সঙ্গে তোমাকে স্বামিসকাশে পাঠাইয়া দিব।" ইনি আদর্শ পিতা বটেন। এরূপ দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞ উদারচরিত পুরুষ লোকশিক্ষার চরম আদর্শ স্থল। কন্যা ও

পিতার সম্বন্ধ ইহা অপেক্ষা সুন্দরতর ও উচ্চতর হইতে পারে না।

এই ঘটনার কিয়ৎপরেই আমরা নাটকমধ্যে মহর্ষির প্রথম সশরীরে দর্শন পাই। প্রত্যুষস্নাতা শকুন্তলাকে প্রথমে পূজনীয়া তাপসীরা ধান্যহস্তে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। তাহার পর সখীরা মাঙ্গল্যপুষ্পবিলেপনাদি দ্বারা এবং পরে বনস্পতিগণ-প্রদত্ত অলঙ্কারাদি দ্বারা শকুন্তলার লাবণ্যময় দেহ অলঙ্কৃত করিলেন; এমন সময় স্নানোত্তীর্ণ ভগবান্ কাশ্যপ তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রথম কথাই অপূর্ব্ব প্রীতিময় ও তত্ত্বকথাপূর্ণ।

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্ট মুৎকণ্ঠয়া।
কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্॥
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ।
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথংনু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈনবৈঃ॥

তিনি অরণ্যবাসী হইলেও কিরূপ স্নেহ-কাতর। তিনি কঠোর তপস্বী নন, বিশ্বপ্রেমে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ। শকুন্তলা প্রণাম করিলে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন :—

"যযাতেরিব শর্ম্মিষ্ঠা ভর্ত্তুর্বহুমতাভব।
সুতং ত্বমপি সম্রাজং সেব পুরুমবাপ্নুহি॥"

এবং তাঁহাকে সদ্যোহুত অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে বলিলেন। প্রদক্ষিণ সমাপিত হইলে পুনরায় কন্যাকে বৈদিকচ্ছন্দে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে শার্ঙ্গরব প্রভৃতি শিষ্যগণকে শকুন্তলার অগ্রে অগ্রে যাইয়া পথ দেখাইতে বলিলেন। তপোবন ছাড়িবার সময় তপোবন-তরুদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন;

"পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।

আস্তে বঃ কুসুমপ্রসূতি সময়ে যস্যাভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥"

এই কথাগুলি শুনিলে শরীর ঈষৎ রোমাঞ্চিত হয়। মহর্ষির অসীমপ্রীতি কেবল মানুষের উপর নয় ভগবৎসৃষ্ট প্রত্যেক পদার্থের উপর। মহর্ষি তরুলতাকেও জীবন্ত মনে করেন। এরূপ করিবার তাঁহার যথেষ্ট কারণ আছে। মানুষের মনোবৃত্তির উপর বাহ্যপ্রকৃতির অতুল প্রভাব। যে সকল তরুলতা ও তাহাদের কিসলয়পুষ্পফলোদ্গম আশৈশব দেখিয়া আসিতেছি তাহাদের সহিত একটা স্নেহময় চিরসৌহৃদ্য সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের হঠাৎ ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। তাহাদের অনুমতি না লইয়া যেন কোথাও বহুদিনের জন্য যাইতে ইচ্ছা করে না। মহাকবি তরুলতা প্রভৃতির এই জীবন্তভাব এখানে বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন। ইংলণ্ডের কোন কোন বড় কবিও এইরূপ বাহ্য প্রকৃতিকে জীবন্ত মনে করেন। Wordsworth এবং Tennyson তন্মধ্যে প্রধান। আবাল্যাভ্যস্ত প্রকৃতির শোভা বহুদিন পরে পুনরায় দেখিলে কিরূপ মনোভাব হয়, Tennyson তাহা বড় সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

"Tears idle tears, I know not what they mean,
Tears from the depth of some divine dispair
Rise in the heart, and gather to the eyes
In looking on the happy Autumn-fields
And thinking of the days that are no more."

বহুদিনের বিরহান্তে প্রিয়জনসমাগমেও প্রথমে চক্ষে জল আইসে। অনেকে শৈশবাভ্যস্ত প্রকৃতির শোভা বহুদিন পরে দেখিয়াও ব্যাকুল হন। প্রকৃতিতে মানুষভাব আরোপ কেবল কবি-

প্রয়োগ নহে, ইহাতে প্রকৃত দার্শনিক তত্ত্ব আছে। কণ্বাশ্রমের অধিবাসিরা তরুলতামৃগপ্রভৃতিতে বিশেষভাবে মনুষ্যত্ব আরোপ করিয়াছেন। শকুন্তলার লতাভগিনীর নাম বনজ্যোৎস্না। বিদায়কালে তিনি সখীদের ন্যায় এই লতাভগিনীকেও শাখারূপ বাহু ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। লতাও পাদপের মিলনকে কবিরা অনেক সময় তাঁহাদের উদ্বাহক্রিয়া বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। কালিদাস 'কুমারে' এই উপমা অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন !

"পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ
স্ফুরৎপ্রবালোষ্ঠমনোহরাভ্যঃ।
লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপুঃ
বিনম্রশাখাভুজবন্ধনানি" ॥

কিন্তু "শকুন্তলে" ইহা অপেক্ষা আরও একটু অধিক স্ফুট এবং আশ্রমের উপযুক্ত সরলমানুষভাবে বাহ্যপ্রকৃতিতে আরোপিত হইয়াছে। বনজ্যোৎস্নার সহিত চ্যুতপাদপের শুধু উদ্বাহক্রিয়া হইয়াছে তাহা নয়, আশ্রমবাসিরা তাহাদের যেন মানুষ বলিয়া ধরিয়া লইতেছেন। ইহা শুধু মুগ্ধস্বভাবা তাপসবালিকাদের বাল্যক্রীড়া নয়। স্বয়ং মহর্ষি বলিতেছেন !

"আমি প্রথমে তোমার নিমিত্ত যাদৃশ স্বামীর ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তুমি পুণ্যবলে তাদৃশ স্বামী প্রাপ্ত হইয়াছ ; এই নবমালিকাও চুতপাদপের সহিত মিলিত হইয়াছে। আমি এক্ষণে ইহার ও তোমার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়াছি।" মহর্ষিও এই নবমাল্লিকা ও চূতপাদপে মনুষ্যত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি ভগবানের মহিমা সর্ব্বত্র দেখিয়া থাকেন ; ক্ষুদ্র তৃণেতেও তাঁহার

স্বীয় কন্যাদের ন্যায় স্নেহপূর্ণ-ভাব। পরমজ্ঞানী মহর্ষি হইলেও তাঁহার হৃদয় কুসুম-কোমল এবং বিশ্বপ্রেমে পূর্ণ।

কালিদাস মহাকবিকে একটু Superstitious করিয়াছেন। কোকিলের কলরবকে তিনি বনস্পতিগণের অনুমোদনসূচক প্রত্যুত্তর মনে করিয়া নিলেন। এরূপ Superstitious অনেকেই। ইহা একটা মনের বিশ্বাস মাত্র। ঈশ্বরপ্রেমিকের এই বিশ্বাস সত্য হইতে পারে। ইহা বিজ্ঞানবিরোধীও নয়। "Coming events cast their shadows beforehand" ইহা একটি মহান সত্য। Shakespereএর নাটকাবলীতে এই ভাব অনেক জায়গায় আছে। এই বিশ্বাস দ্বারা মহর্ষির চরিত্রও একটু বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। এরূপ হইতে পারে সেকালে কোকিলের কলরব বিষয়ে একটা বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। মহর্ষি সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিলেন। মহর্ষি আপনাকে এত জ্ঞানী মনে করেন না যে এই প্রচলিত বিশ্বাসকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেন। কেহই বলিতে পারে না এই বিশ্বাসের মূলে কোন সত্য নাই।

তপোবন-দেবতাদের আশীর্ব্বাদ অলৌকিক হইলেও কালিদাসের কাব্যে ইহা নূতন নহে। তিনি মধ্যে মধ্যে বনদেবতাদিগকে মনুষ্যচক্ষুর গোচর করিয়া থাকেন। কুমারে এই বনদেবতারা উমার সখীভূতা;

"অনুপ্রয়াতা বনদেবতাভ্যাং
অদৃশ্যত স্থাবররাজকন্যা।"

ভগবান্ কণ্বের আশ্রমে এই বনদেবতাদের আবির্ভাব আশ্চর্য্যজনক নহে। মহাকবি তাঁহার তপঃপ্রভাব দেখাইয়াছেন।

শকুন্তলা সখীদের নিকট হইতে ক্রমে বিদায় লইতেছেন। বড় হৃদয়-বিদারক করুণ দৃশ্য। মহর্ষিও প্রাণে বড় ব্যথা পাইতেছেন। তথাপি তাঁহার কর্ত্তব্য ভুলিতেছেন না। একবার অনসূয়াকে বলিলেন "অনসূয়ে, রোদন করিও না; শকুন্তলাকে স্থির করা তোমাদের দুজনেরই কর্ত্তব্য।" পুত্রীকৃত মাতৃহীন মৃগশাবক শকুন্তলার বসনাঞ্চল টানিতে লাগিল। শকুন্তলা ফিরিয়া দেখিলেন। করুণ-হৃদয় মহর্ষি বলিতে লাগিলেন;

"যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণমীঙ্গুদীনাং
তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে।
শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্দ্ধিতকো জহাতি
সোঽয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে॥"

শকুন্তলা মৃগশিশুকে দুকথা বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, মহর্ষিরও অন্তঃকরণ আর্দ্রীভূত। কিন্তু তিনি শকুন্তলাকে সাবধান করিতেছেন; "একটু স্থির হইয়া দৃষ্টিশক্তির আবরক অশ্রুপ্রবাহ নিরোধ কর। উদ্‌ঘাতিনীভূমিতে তোমার পদস্খলন হইতেছে।"

মহর্ষি লোকাচারও মানিয়া থাকেন। "জলাশয় পর্য্যন্ত স্নিগ্ধজনের যাওয়া কর্ত্তব্য" শিষ্যের এই কথায় মহর্ষি কন্যাকে শেষবিদায় দিবার জন্য ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইলেন। সেইখানে মনে মনে চিন্তা করিয়া রাজাকে কি বলিবেন তাহা ঠিক করিয়া শিষ্যের নিকট নিজ বক্তব্য বলিলেন। এই দুষ্মন্তসন্দেশের মধ্যে সার কথা এই টুকু; "আমি তপস্বী, আপনি রাজা এবং শকুন্তলার আপনার প্রতি স্বকৃত প্রগাঢ় অনুরাগ; এই কয়েকটি বিষয় বিশেষ অনুধাবন করিয়া আমার কন্যার প্রতি আপনার অন্যান্য পত্নীদের ন্যায় সাধারণগৌরব প্রদর্শন করিবেন। ইহার অধিক সৌভাগ্য ভাগ্যের বিষয়। কন্যার পিতার সে বিষয় বলা

উচিত নয়।" সকলেই চায় "আমার কন্যা শ্বশুর কুলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরবশালিনী হউক।" মহর্ষি কেবল সাধারণগৌরব চাহিলেন। তিনি স্বার্থশূন্য মহাপুরুষ। যাহা উচিত তাহাই চাহিলেন। তিনি আদর্শ পিতা এবং আদর্শ মানুষ।

শকুন্তলাকে মহর্ষি শ্বশুরালয়ে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে উপদেশ দিলেন তাহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে প্রযুজ্য :

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তু বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভবদক্ষিণাপরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ"॥

সেকালে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। একালে "সপত্নীজনে" পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া "স্বদাসীজনে" এই পাঠ করিলেই ঠিক হয়। কন্যাকে এই উপদেশ দিয়া মহর্ষির মন ঠিক মানে নাই। বর্ষীয়সী রমণীরা হয়ত তাঁহা অপেক্ষা বেশী জানেন মনে করিয়া বলিলেন, "গৌতমীর এ বিষয়ে কি মত"? গৌতমী বলিলেন, "বধূর প্রতি ইহাই প্রকৃত উপদেশ" এবং শকুন্তলাকে তাহা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে বলিলেন। "বলবদপি শিক্ষিতানাং আত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ"। সেইজন্য গৌতমীর মতগ্রহণ। মহর্ষি সর্ব্বগুণভূষিত।

মহর্ষি সংসারী না হইলেও সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্যে তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি। শকুন্তলা বলিলেন, পিতঃ, সখীরা কি এখান হইতে ফিরিবে।" পিতা বলিলেন, "বৎসে, ইমে অপি প্রদেয়ে।" ইহাদিগকেও সম্প্রদান করিতে হইবে। তাহাদের আর বেশীদূর যাওয়া উচিত নয়। প্রবীণা গৌতমী শকুন্তলার সঙ্গে রাজভবনে যাইবেন। শকুন্তলা ভাবিপিতৃবিরহে বড়ই কাতর

হইলেন। আদর্শ পিতা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন; "বৎসে, কেন কাতরা হইতেছ? স্বামি-গৃহে গৃহিণীপদ পাইয়া সংসারের গুরুতর কর্ত্তব্যে অনুক্ষণ ব্যস্ত থাকিবে" এবং শীঘ্রই কুলপাবন পুত্র প্রসব করিয়া আমার বিয়োগজনিত শোক তত অনুভব করিবে না।" শকুন্তলা পিতাকে প্রণাম এবং উভয় সখীকে একসঙ্গে আলিঙ্গন করিলেন। শিষ্যেরা তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল। শকুন্তলা আবার পিতার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আবার কবে তপোবন দেখিতে পাইবেন। কণ্ব বলিলেন,

"ভূত্বা চিরায় চতুরন্তমহীসপত্নী
দৌষ্যন্তিমপ্রতিরথং তনয়ং নিবেশ্য।
ভর্ত্রা তদর্পিতকুটুম্বভরেণ সার্দ্ধং
শান্তে করিষ্যসি পদং পুনরাশ্রমেঽস্মিন্॥"

ইহাতে বুদ্ধিমতী কন্যার কতকটা আশ্বস্ত হইবার কথা। কিন্তু কথা আর ফুরায় না। এবার গৌতমী পিতা ও কন্যা উভয়কে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন এবং গমনবেলা অতিক্রান্ত হইতেছে বলিলেন। এইবার সত্য সত্য বিদায় কালে উপস্থিত। মহর্ষিও অনুচিত বিলম্ব দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বৎসে, তপোঽনুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইতেছে"। এই কথার পর শকুন্তলা আর বিলম্ব করিলেন না। বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি পিতার উপযুক্ত কন্যা। শেষ বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইয়া পিতাকে পুনরালিঙ্গন করিলেন এবং নিজেই পিতাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন "আপনার শরীর তপশ্চরণ জন্য পীড়িত। আপনি আমার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইবেন না।" এইবার মহর্ষি আর থাকিতে পারিলেন না। এবার সত্য সত্যই কন্যা চলিয়া যাইতেছে। এতক্ষণ মেঘ ঘনীভূত

হইতেছিল। এবার বারিবর্ষণ হইল। মহর্ষি যেন কাঁদিয়া ফেলিলেন। নিশ্বাসত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বৎসে, তুমি পূর্ব্বে কুটীরদ্বারে নীবারধান্যে যে পূজোপহার দিয়াছিলে, তাহা এক্ষণে অঙ্কুরিত হইয়াছে; তাহা দেখিয়া কি করিয়া আমার শোকের শান্তি হইবে।" পরমুহূর্ত্তেই বলিলেন, বৎসে, পতিগৃহে গমন কর; পথে তোমার মঙ্গল হউক।" এই মহর্ষি কণ্ব অদ্ভূত-চরিত। এই জন্যই কবি বলিয়াছেন,

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোনুবিজ্ঞাতুমর্হতি॥"

কণ্বমুনি লোকোত্তরচরিত। ক্রমে শকুন্তলা নয়নপথের অতীত হইলেন। সখীরা কাঁদিয়া ফেলিলেন। মহর্ষি এখনো দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"অনসূয়ে, তোমাদের সহধর্ম্মচারিণী চলিয়া গেলেন; শোক নিরোধ করিয়া আমার অনুগমন কর"। উভয় কন্যাই বলি-লেন, "পিতঃ, শকুন্তলা নাই বলিয়া যেন শূন্য তপোবনে প্রবেশ করিতেছি"। তত্ত্বজ্ঞানী মহামুনি বলিলেন, "স্নেহ-প্রবৃত্তি এইরূপ দেখিয়া থাকে"। তারপর চিন্তাকুলভাবে পর্ণশালার দিকে যাইতে যাইতে যেন আপন মনেই বলিতে লাগিলেন, 'আঃ, আজ শকুন্তলাকে স্বামিগৃহে পাঠাইয়া স্বাস্থ্যলাভ করি- লাম। যেহেতু, কন্যা পরের সামগ্রী। গচ্ছিত অর্থ প্রত্যর্পণ করিলে চিত্ত যেমন অতিশয় নির্ম্মল ও নিশ্চিন্ত হয়, আজ শকুন্তলাকে তাহার পতিগৃহে পাঠাইয়া আমার মনও সেইরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াছে।' পিতা ও কন্যার সম্বন্ধ বিষয়ে ইহাই যথার্থ তত্ত্বকথা। এরূপ সম্বন্ধ ভারতবর্ষীয় মহাকবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক ভিন্ন আর কোথাও এমন উৎকৃষ্ট ভাবে দেখান হয় নাই।

আদর্শপিতার চরিত্র দেখাইবার জন্য মহাকবির এই মহর্ষি-চরিত্রসৃষ্টি। মহাকবি Shakespere এর একখানি উৎকৃষ্ট নাটকেও (Tempest) পিতা ও কন্যার এইরূপ ছবি কিয়ৎ-পরিমাণে আমরা দেখিতে পাই। Prosperoর জীবনসম্বল তাঁহার একমাত্র কন্যা অনিন্দ্যসুন্দরী মিরাণ্ডা। তিনিও কন্যাকে উপযুক্ত নৈতিকশিক্ষা দিয়াছেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বগুণভূষিতা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কন্যার প্রতি ব্যবহার যথেষ্ট পিতৃস্নেহপূর্ণ হইলেও একটু যেন কঠিনতাযুক্ত (severe)। তিনি কন্যার উপর পিতার অধিকার একটু কঠিনতার সহিত বিস্তার করিয়াছিলেন। Shakespereএর বোধ হয় আদর্শপিতা অঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্য নয়। অন্যান্য নাটকীয় ঘটনা পরিস্ফুট করিবার জন্য Prosperoর সৃষ্টি। ভারতবর্ষীয় মহাকবি আদর্শ-চরিত ঋষি এবং আদর্শপিতার ছবি বিশেষ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। মহাকবি দেখাইয়াছেন রাজা দুষ্যন্ত উপযুক্ত বংশ হইতেই রমণীরত্ন লাভ করিয়াছেন। এক চতুর্থাঙ্কেই মহাকবি এই অপূর্ব্ব বিরাট ঋষিমূর্ত্তি দেখাইয়াছেন। নাটকে এই চতুর্থাঙ্কের পর আর মহর্ষি লোকলোচনগোচর হয়েন নাই। কিন্তু তাঁহার বিরাট সত্তা ও মহামহিমাময় চরিত আমাদের হৃদয়ে চিরকালের জন্য অঙ্কিত রহিয়াছে। এই পুণ্যময় মহান্ আদর্শ জগতের প্রভূত মঙ্গল বিধানে সমর্থ।